ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পূজারীর এককণা কৃপায় নরেন্দ্র জগজ্জয়ী

১

মর্টন স্কুল। সিঁড়ির ঘর। এখন অপরাহ্ন ছয়টা। শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট। শ্রীম-র সম্মুখে বেঞ্চেতে বসা জগবন্ধু, হরেন্দ্র দত্ত, তাহার সঙ্গী প্রভৃতি।

আজ ১৮ই আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৩৩১ সাল। সোমবার কৃষ্ণাচতুর্থী। কথামৃত বর্ষণ হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আপনারা সব যান নববিধানে। আজও উৎসব। অনেকে বক্তৃতা দিবেন।

ভক্তরা সেখানে গেলেন। একটু পর গেলেন ডাক্তার কার্তিকবাবু, বিনয়, ছোট অমূল্য, ভৌমিক, উপাধ্যায় ও ফকিরবাবু। সাতটার সময় শ্রীম স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন নববিধানে। আজ ব্রাহ্ম যুবকদের প্রতি উপদেশের দিন।

আচার্য প্রমথ সেন বলিলেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে চরিত্রবান হও। এই প্রথম যৌবন হতে তোমরা ঈশ্বরের উপাসনা কর। আর সংসারে কাজও কর। দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশই এই। এই যৌবন-কালই ভক্তিবিশ্বাস লাভের উপযুক্ত সময়। এই সময় যাঁরা যতটা ভক্তিবিশ্বাস উপার্জন করবেন, তাঁরাই মনের শান্তিতে থাকবেন। অপরকেও ভাল করতে পারবেন। ভাই হীরানন্দ সিন্ধুদেশের লোক। তিনি প্রথম যৌবনেই ব্রহ্মানন্দের (কেশবচন্দ্রের) সঙ্গলাভ করেছিলেন। তারপর হীরানন্দ সঙ্গ পান দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের। এঁদের প্রভাবে প্রচুর ভক্তিবিশ্বাস লাভ করেছিলেন। তার বলেই সুদৃঢ় চরিত্র লাভ করেন। এই সুচরিত্রের প্রভাবে বর্তমানে সিন্ধুদেশের তিনি একজন জনক। তোমরা তাঁর এই সুমহৎ আদর্শ গ্রহণ কর। নিজে ধন্য হও, দেশকে ধন্য কর।

ইহার পর বলিলেন অধ্যাপক কামাখ্যাবাবু। যৌবনকালই ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি যত শক্ত হবে পরবর্তী জীবন তত মধুর হবে।

দু'টি জিনিস চাই এর জন্যে। একটি ঈশ্বরে বিশ্বাস, দ্বিতীয়টি ব্রহ্মচর্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস যাঁর আছে তিনি সত্যবাদী। সত্য ও ব্রহ্মচর্য — ঈশ্বরে বিশ্বাসলাভের দু'টি স্তম্ভ। যাঁর সত্য ব্রহ্মচর্য ও ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা আছে তিনি চরিত্রবান। তাঁর দ্বারাই মহৎ কার্য সাধিত হয়। তিনি নিজেও চিত্তে আনন্দ লাভ করেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবের সঙ্গগুণে সামান্য লোকও বড় হয়েছেন। তাঁর ভালবাসায় তাঁরা ঈশ্বরে ভক্তিবিশ্বাসবান হয়ে কত বড় কাজ করছেন। নিজেরাও শান্তি সুখ আনন্দ লাভ করেছেন।

এবার সুবিখ্যাত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি বলিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়া সুমহৎ কাজ হয় না। চরিত্র তৈরি হয় না। চরিত্রের বলে অসাধ্য সাধন হয়। তোমরা দেশের ভবিষ্যৎ। তোমরা চরিত্র নির্মাণ করে সেবা কর। দেশ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে। যুবশক্তি ছাড়া কোন দেশ উঠতে পারে না। তোমরা জাগ, দেশকে উঠাও।

রাত্রি সাড়ে আটটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে মর্টন স্কুলের দোতলার সভাগৃহে বসিয়া আছেন মাদুরে। এইমাত্র নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ হইতে ফিরিয়াছেন। ভক্তগণ সভার কথা আলোচনা করিতেছেন। একজন বলিলেন, সভায় আজ কেউ কেউ ঠাকুরের কথা বলেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এখন তো কত লোক তাঁর নাম করছে। কিন্তু যারা ঐদিনে তাঁকে ভালবাসতো তারা কত বড় লোক। ঐশ্বর্য প্রকাশ হলে তো সকলেই ভালবাসে।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর পড়ে আছেন। সাত টাকা মাইনে। আবার উন্মাদ। তখন যারা তাঁকে চিনেছিল তারা কে গো? তারা সামান্য লোক নয়।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন — উদ্ধব, যাও গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস শীঘ্র। যখন আমার কোনও ঐশ্বর্য ছিল না, যখন আমি গ্রাম্য লোক, রাখাল ছিলাম, সেই সময় গোপীরা আমাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। যাও, শীঘ্র সেই গোপীদের সংবাদ নিয়ে এস। এতদিন রাজকার্যে সব ভুলে গিছলাম। তাদের ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারবো না। তারা যদি নিজ গুণে কৃপা করে আমায় ঋণমুক্ত করে তবেই হতে পারে। নইলে এই ঋণ শোধ হয় না।

অবতারকে কি চিনবার যো আছে? মানুষ চিনতে পারে না। তাঁর

ইচ্ছাতেই কেবল কয়েকজন চিনেছিল। একেবারে মানুষ হয়ে আসেন, মানুষের সব নিয়ে — শোক তাপ ভাল মন্দ সব। এই আবরণে ঢাকা থাকেন। এরই ভিতর দু'চার জনকে ধাঁধা লাগিয়ে দেন নিজের স্বরূপ দেখিয়ে। এই আবরণের ভেতরই তাঁর সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য দেখে ভক্তগণ অবাক হয়। সংশয়ে পড়ে যায় — এ, দেব কি মানব! তাই তো, মাঝে মাঝে নিজের স্বরূপ নিয়ে আমোদ করতেন ভক্তদের সঙ্গে। বলতেন, কি গো, কি বল, গিরিশ যা বলছে (অবতার)? কখনো বলতেন — অচিন্ গাছ একটা আছে, তাকে চেনা যায় না। কখনও একটা গান গাইতেন,

তোরা কেউ তাঁরে চিনলি না রে।
সে যে দীন হীন কাঙ্গালের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে॥

অবতারকে যে চিনতে পারে তার আর কিছু করতে হবে না, ব্যস্। তার এতেই সব হয়ে যাবে। বল না, চিনে কেমন করে? একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা, আভিজাত্য, অপর দিকে নিরক্ষর পূজারী — দরিদ্রের হদ্দ। কিন্তু শেষে তাঁরই জয়। শিক্ষা, আভিজাত্য কুল শীল মান সব ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ঐ পূজারী ব্রাহ্মণের এককণা কৃপায় নরেন্দ্র আজ জগৎজয়ী। ঐ দরিদ্র পূজারী আজ জগৎপূজ্য। রাজসিক প্রতীচী তাঁর চরণে মাথা লুটিয়েছে। অবতারের লীলা বোঝে সাধ্য কার? বিচিত্র তাঁর খেলা!

২

পরদিন মঙ্গলবার। শ্রীম কথকতা শুনিতে পঞ্চানন ঘোষ লেনে গিয়াছিলেন। জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তদের টাউন হলে ধর্ম-বক্তৃতা শুনিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীম কথকতা হইতে ফিরিয়া নৈশ আহার শেষ করিয়া আসিয়াছেন। ভক্তগণ দোতলার বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি সাড়ে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম বেঞ্চেতে বসিয়া দুই চারিটি কথা কহিয়া ভক্তদের বিদায় দিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — বৃন্দাবনলীলার কথা হচ্ছিল। উদ্ধব-সংবাদ। উদ্ধব মথুরা থেকে গোপীদের সংবাদ নিতে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পাঠিয়ে দিয়েছেন। উদ্ধব দেখলেন, একটি গোপী গো-দোহন করছে, আর কৃষ্ণ বিরহের গান করছে। অপরের রচিত গান নয়। প্রাণের আবেগে যে সব

ভাব হৃদয় থেকে বের হচ্ছে তাই গানের সুরে গাইছে। গো-দোহনে মন নাই। শিশু সন্তান দুধের জন্য কাঁদছে। গোপীর কানে সে ক্রন্দনধ্বনি পৌঁছাচ্ছে না। পতি বার বার ডাকছে, বলছে, শিশু কাঁদছে। বলছে, শীঘ্র এস দুধ নিয়ে — শুনছে না। শেষে ধাক্কা মেরেছে। তখন সুপ্তোত্থিতের মত, বিজড়িত কণ্ঠে বলছে, হাঁ কি? উদ্ধব দেখলেন, গোপীর বাহ্যজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত। কৃষ্ণচিন্তায় মনটি ডুবে গেছে, গলে গেছে, কৃষ্ণময় হয়ে গেছে, কৃষ্ণ হয়ে গেছে। হাত যন্ত্রের মত কাজ করছিল — দুধ দুহাচ্ছিল। শেষে তা-ও বন্ধ হয়ে গেল 'ডুবিল কৃষ্ণরূপ-সাগরে আমার মন'। ভাব সমাধি।

জ্ঞানী ভক্ত উদ্ধবের জ্ঞানে পড়ল নিদারুণ আঘাত। উদ্ধব গোপীদের এসেই বলেছিলেন, তোমাদের প্রিয় কৃষ্ণ, অবতার। মানুষ হয়ে নরলীলা করছেন। তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অধ্যক্ষ।

এই গোপীর শ্রীকৃষ্ণে ভালবাসা দেখে উদ্ধবের লজ্জা হলো। ভাবলেন, বৃথা আমার জ্ঞানবিচার — ধন্য গোপী!

এই একটি সিন। আর একটি সিন হচ্ছে এই — একজন গোপী চরকাতে সুতো কাট্‌ছে আর গান গাইছে। শিশুপুত্র মা খেতে দাও, খেতে দাও বলছে। হুঁস নাই। ধাক্কা দিচ্ছে, হুঁস নাই। তকলি হাত থেকে পড়ে গেছে। হাত কোলের ওপর পড়ে আছে। ডিমে তা দেওয়া পাখীর মত চক্ষু পলকহীন। বেভোলা। শ্বাস পড়ছে, কি না পড়ছে! ছেলে মায়ের বুকে কেঁদে উঠলো — মা হয়তো মরে গেছে ভেবে। অপর লোক ছেলে কাঁদছে শুনে এসে হাত ধরে টান দিল জোরে। তখন চট্‌কা ভাঙ্গলো।

উদ্ধব অবাক্ হয়ে এ দৃশ্য দর্শন করলেন। তাঁর জ্ঞানবিচারে দ্বিতীয়বার আঘাত পড়ল। শ্রীকৃষ্ণবিরহে গোপী মৃতপ্রায়। 'মজিল কৃষ্ণ প্রেমসাগরে গোপীর মন।'

আর একটি দৃশ্য যমুনাতীরে। গোপীর মাথার ওপর তিনটি বলডুই (কলসী, পিতলের)। গান গাইতে গাইতে চলছে। স্নান করা ও জল ভরতে আজ দেরী হয়ে গেছে। আর সকলে চলে গেছে অনেক পূর্বেই। সে একাকিনী। জলের ধারে কলসী রেখে বসে, বাহুদ্বয় জল দিয়ে রগড়াচ্ছে। মুখে কৃষ্ণের ভালবাসার গান। কার্তিকের পূর্ণ চন্দ্রালোকে

বনভূমি, যমুনাতীর — সকল জগৎ ডুবে গিছলো। সেইদিনের কৃষ্ণপ্রেমের গান, রাসের প্রেমানন্দের গান। উদ্ধব যমুনাতীরে দাঁড়িয়ে দেখছে এই লীলা। গান গাইতে গাইতে রাসলীলার রাত্রির মত গোপী জগৎ ভুলল। কৃষ্ণ-রসসাগরে গোপীর জীবাত্মা বিলীন। উদ্ধব দেখছেন, গানের স্বর বন্ধ হয়েছে। আরো কাছে এসে দেখলেন, গোপীর মুখমণ্ডল মধুর জ্যোতির্ময়। প্রাণ যেন দেহে নাই। পরিধেয় বস্ত্রাদি শিথিল, স্থানচ্যুত। লজ্জার ধার ধারে না। দীর্ঘকাল পরে বাড়ির লোক তাকে খুঁজতে এলো। জলের অভাবে সকলে তৃষ্ণার্ত। গাভী বৎসগণ পিপাসার্ত। তাকে টেনে উঠালো। ভাবের নেশায় তখনও। ঐ নেশায় চীৎকার করে বলল — 'প্রাণ হে কৃষ্ণ মম জীবন'।

তৃতীয়বার কঠিন মুদ্গরের আঘাতে চূর্ণ হলো উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতির অভিমান। উদ্ধব বুঝলেন, একখণ্ড প্রস্তরের সঙ্গে এক ঢেলা মাখনের যে সম্পর্ক, উদ্ধবের কৃষ্ণপ্রীতির সঙ্গে গোপীদের মন প্রাণ দেহজ্ঞান বিগলিত কৃষ্ণপ্রেমের সেই সম্পর্ক।

আহা কি শক্তি এই কথকদের! এমন বিবরণ, যেন চোখের সামনে হচ্ছে এই লীলা। লোক যেন মদের নেশার মত অবশ হয়ে বসে রইল। Emotion-টাকে (মনের কোমল ভাবটাকে) sublimate করে (ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়ে) দেয়।

তারপর একটি গান গাইল। দুটি পদ মনে করে এনেছি। তাই আপনাদের উপহার দিচ্ছি। এইটি গাইতে গাইতে আপনারা ঘরে যান। গানটি উদ্ধবের মুখের।

ধন্য গোপী ধন্য গোপী ধন্য বৃন্দাবন।
হেথা করলো কৃষ্ণপ্রেম মুরতি ধারণ।।

পরদিন বুধবার ২০শে আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ, ৪ঠা ভাদ্র ১৩৩১ সাল। নববিধান ব্রাহ্মসমাজে এখনও উৎসব চলিতেছে। পূর্বের বিষয় ছিল জেনারেল বুথের জীবনালোচনা। জগবন্ধু, ডাক্তার, বিনয়, ছোট অমূল্য রজনী, উপাধ্যায় নববিধান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

শ্রীম মর্টন স্কুলের দ্বিতলে বারান্দায় বেঞ্চেতে বসিয়া আছেন। ইতিমধ্যে

বড় জিতেনও আসিলেন। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — জেনারেল বুথই 'স্যলভেশান আর্মি-র' (Salvation Army) প্রতিষ্ঠাতা। World-এ (জগতে) খুব বড় organisation (প্রতিষ্ঠান)। Fallen Women-দের (পতিতাদের) তারা উদ্ধার করছে। এদের সকলকে দেখলে ক্রাইস্টের কথা মনে পড়ে — তাঁর উদ্দীপন হয়। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে তিনি এসেছিলেন। তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি কাজ ছিল পতিতার উদ্ধার। সেটিকে বীজরূপে গ্রহণ করে আজও আবার লোক অনেক কাজ করছে। অবতারের প্রত্যেকটি কাজ এক একটি জীবন্ত ভাব। এক একটি শক্তিকেন্দ্র। যেমন ডায়নামো, হাজার হাজার বছর ধরে উহা কাজ করে।

মেরীকে উদ্ধার করেছিলেন ক্রাইস্ট। মনে হয় মূলে ঐ কার্যটি; তারা ঐটিকে আদর্শ করে কাজ করছে।

ক্রাইস্ট বলেছিলেন, যারা সুস্থ তাদের ডাক্তারের দরকার নাই। অসুস্থদের প্রয়োজন। তেমনি আমি এসেছি পাপীতাপীদের জন্য। কেবল ধার্মিকের জন্যই নয়। 'I come not to call the righteous, but the sinners to repentance.' (Mark 2:17)

মেরী ছিলেন বড়লোকের মেয়ে। বাপ মা মরে যায়। ম্যাকডেলা প্রাসাদে বাস করেন। অসাধারণ রূপবতী। বাপমায়ের মৃত্যুর পর চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। বিলাসিনী হয়ে পড়েন। শোনা যায়, তাঁর পোশাক ও অলংকারাদি গ্রীস ও রোম থেকে আসতো। পরে আপনি অনুশোচনা হয়। একদিন ক্রাইস্ট তাঁর প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ বুঝলেন, তাঁর সমস্ত পাপ চলে গেছে। আর ক্রাইস্টের পবিত্রতা ওঁর মধ্যে ঢুকে গেছে। সেই থেকে কঠোর তপস্যা করছেন। মাথার চুল ছোট করলেন। চট পরতেন আর কাঁদতেন। একদিন ক্রাইস্ট ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে পিটারের কুটীরে আছেন। মেরী ছুটে এসে পায়ে পড়ে। কি কান্না! পা ভিজে গেছে! আর তিনি মাথার চুল দিয়ে পুঁছে দিচ্ছেন। তাঁর কৃপা হলো। বললেন, তুমি পাপমুক্ত হয়ে গেলে দেবী – 'Woman, thy sins are forgiven.' (St. Luke 7:48) মৃত্যুর পর মেরীকেই প্রথম দেখা দেন। কবরের কাছে বসে কাঁদতেন। আহা কত প্রেম!

তাঁর আর একটি বাণী — যে অনাথ শিশুদের আশ্রয় দেয় তার ওপর ভগবানের দয়া হবে। এইটি নিয়ে হয়েছে যত অনাথ আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠা।

অবতারের এক একটি বাণী মূর্তিপরিগ্রহ করে কালে।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো মনে ঐ সব কাজ পছন্দ করেন না। শ্রীম তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর একঘেয়ে হতে ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে তাই নানারকমের ভক্ত আসতো। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান। আবার হিন্দুদের নানাপথের ভক্ত আসতো — কর্তাভজা, ঘোষপাড়া — নবরসিক পর্যন্ত ছাড়েন নি। একদিকে বেদান্তে শুদ্ধ-সাধক, অন্যদিকে তন্ত্রের বীরাচারী — যেন অচলানন্দ। কাউকেও ছাড়েন নাই। তিনি খেতেন কুল — কাঁটার ভিতর থেকে। ভক্তিটি নিতেন। তাই কেশব সেনকে বলেছিলেন, রাসলীলা নাইবা নিলে, কিন্তু কৃষ্ণের জন্য গোপীদের টানটুকু নেও।

খালি কি গিরিশবাবুকেই কোলে তুলে নিয়েছেন? থিয়েটারের অনেক লোককে উদ্ধার করেছেন — স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই। কি বলে, ঠগ বাছতে গাঁও উজাড়।

শুদ্ধ ভক্ত হয় বহু তপস্যা থাকলে। ভক্ত ছাড়া ঠাকুর থাকতে পারতেন না। শুদ্ধ ভক্তদের জন্য কাঁদতেন। বাইশ বছর কেঁদেছিলেন। তবে তাঁরা আসেন। এর পূর্বে অনেক রকমের ভক্ত যেতো তাঁর কাছে। তাদের সঙ্গেই যতটুকু সম্ভব ঈশ্বরীয় কথা কইতেন, তার আনন্দ উপভোগ করতেন। ঠিক ঠিক ভক্তসঙ্গ বহু তপস্যার ফল।

৩

কাল জন্মাষ্টমী। শ্রীম মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। শ্রীম-র সম্মুখে তিন দিকে ভক্তগণ বেঞ্চেতে বসা — ডাক্তার কার্তিক বক্সী, বিনয়, ছোট অমূল্য, বড় জিতেন, বড় অমূল্য, বলাই, গদাধর, শান্তি, মোটা সুধীর, উপাধ্যায়, সিলেটের রজনী, ছোট নলিনী, ভাটপাড়ার বড় ললিত, জগবন্ধু প্রভৃতি। এখন রাত্রি আটটা।

একজন নূতন ভক্ত আসিয়াছে।

আজ বিকালে শ্রীম রজনীকে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। মির্জাপুর স্ট্রীটের কাছে রমানাথ মজুমদার লেনে এই আশ্রম অবস্থিত। রজনী ইহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। এই বিষয় লইয়া ভক্তসভায় নানারূপ সমালোচনা চলিতেছে। শ্রীম-ও বিস্মিত হইয়াছেন, রাস্তাটি পর্যন্ত বাহির করিতে পারেন নাই শুনিয়া।

রজনী সরল গ্রাম্য লোক। বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখর নয়। কেহ তাহার সঙ্গে গিয়া রাস্তাটি দেখাইয়া দেয় — শ্রীম-র এই ইচ্ছা।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি সহাস্যে) — ইনি রাস্তা খুঁজে পান নাই। (শান্তির প্রতি) দেখে আসবে একবার? না, তুমি আবার ক্যাম্বেল (মেডিকেল স্কুল) থেকে এসেছ, বড্ড tired (পরিশ্রান্ত)।

(সকলের প্রতি) — কোন্ বীর মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে কতলুখাঁকে সুবর্ণরেখা (নদী) পার করে দিতে পারে?

জগৎ সিংহ দাঁড়ালো। বললো, পাঁচ হাজারেই কাজ হয়ে যাবে। কেবল জগৎ সিংহই পারে। এ তারই কাজ।

শান্তি উঠিয়া দাঁড়াইল, মুখে হাসি।

শ্রীম (শান্তির প্রতি) — যাচ্ছ? বা! দেখবো কেমন — ।

পার্বতী মিত্র ছিলেন ঘোড়ার বেপারী ধর্মতলার হার্ট (Hart) কোম্পানীর ম্যানেজার — নাগ মহাশয়ের ভক্ত। তাঁহার গৃহে নাগ মহাশয়ের উৎসব হইবে। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাকে শ্রীম-র নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন। দুর্গা করজোড়ে শ্রীমকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীম বলিলেন, আমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা কম — old man (বৃদ্ধ) কিনা। ভক্তরা যাবেন কেউ কেউ। দুর্গা প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

অনেকদিন বলার পর উপাধ্যায় আজ বেলুড় মঠ দর্শন করিয়া আসিয়াছে। শ্রীম তাহার মুখে মঠের বিবরণ শুনিতেছেন। এই প্রসঙ্গে রকমারী সাধুর কথা উত্থাপন করিলেন। এই সূত্রে রজোগুণী তমোগুণী সাধুর কথা উঠিল। কেহ গাঁজা খায়, কেহ ক্রোধী, এইসব কথা হইতেছে। এই মুখরোচক পরনিন্দার কথা শুনিয়া এই নিম্নগামী স্রোতের প্রবাহ উল্টাইয়া ঊর্ধ্বগামী করিয়া দিলেন শ্রীম।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের তখন শরীর আছে — এইটিন এইটিটু (১৮৮২)। আমরা বড়বাজারে সাধু দেখতে গিছলাম। একজন নিয়ে গিয়ে আমাদের introduce (পরিচয়) করিয়ে দিলেন বড় শিখ-সঙ্গতে। একজন বৃদ্ধ সাধু আমাদের উপদেশ দিয়েছিলেন, ঐ কথা — সাধুসঙ্গ কর।

ঐ কথাটি বলে সাধু একটি গল্প বললেন। গল্পটি এই — মানস সরোবরে একজন পক্ষীযজ্ঞ করতো। তার অভিপ্রায় এই ছিল, পক্ষীযজ্ঞ করলে সেখানে নানা পক্ষী আসবে। তার সঙ্গে হংসও আসবে। হংসের সঙ্গে পরমহংস আসবে নিশ্চয়। পরমহংস মানে বিষ্ণু।

এর মানে হলো এই — সাধু যে রকমই হোন তাঁকে সম্মান করা উচিত। সম্মান করতে করতে, পূজা করতে করতে যদি কপাল ভাল থাকে, তা হলে এই আয়োজনেই ঈশ্বরের কৃপা হতে পারে। শেষে তাঁর দর্শন হয়ে যেতে পারে।

কেন তুমি সাধুদের সম্মান করছো? ঈশ্বরের জন্য কিনা। তাই এতে ঈশ্বরের কৃপা হতে পারে।

শ্রীম (উপাধ্যায়ের প্রতি) — ঠাকুরও একটি গল্প বলেছিলেন আমাদের কাছে। একজন সাধু স্নান করছিলেন। কৌপীন খুলে জলে দাঁড়িয়ে উহা পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ ওটা হাত থেকে পড়ে গিয়ে জলে ভেসে গেল। সেই সময় দ্রৌপদীও স্নান করছিলেন। তিনি তখন আপনার কাপড়ের অর্ধেকখানা ছিঁড়ে সাধুকে দিলেন। সাধু উহা পরে তবে উপরে আসেন।

কৌরবসভায় যখন দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ হচ্ছিল তখন তিনি লজ্জা-নিবারণ নারায়ণকে প্রাণভরে ডাকছেন। ভগবান দেখা দিয়ে বললেন, তুমি কি কখনও সাধুকে বস্ত্র দান করেছ? দ্রৌপদী স্মরণ করে বললেন, এই গল্পটি। তখন ভগবান বললেন, তা'হলে আর তোমার ভয় নাই। দুঃশাসন যত টানছে দ্রৌপদীর বস্ত্র ততই বেড়ে যাচ্ছে।

এর মানে হলো এই। সাধু ভগবানের রূপ। তাঁর পূজা করলে, তাঁকে পূজা করলে, ভগবানকেই পূজা করা হয়।

গল্পটি বলেই ঠাকুর আবার বলিয়ে নিলেন যাকে বলেছিলেন তার

মুখ দিয়ে (শ্রীম-র মুখ দিয়ে)। কেন? যাতে মনে ছাপ পড়ে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — মুখে বললেই হলো — সাধু কিছু নয় – all men are equal (সব মানুষ সমান)?

সাধু ঈশ্বরকে ধরে থাকেন। তাই যারা সাধুকে ধরে থাকে, অর্থাৎ ভক্তরা, তারা ঈশ্বরকেই ধরে।

ঈশ্বরকে প্রেমময় বলে। লোকে কি বোঝে এই কথায়? মানুষের ভিতর দিয়ে যখন দেখতে পায় এই প্রেম, তখনই এই কথার অর্থ বোধ হয়।

মানুষের ভিতর পশু, মানুষ ও দেবতা — এই তিনই রয়েছে। বাইরের রূপটা তো সকল মানুষেরই এক। কিন্তু, ভিতরের গুণের প্রভেদেই ঐরূপ ভিতরের রূপ ভেদ হয়।

যদি কোন মানুষে দেখা যায় যে তিনি অপরকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিচ্ছেন, সকল দুঃখ বরণ করছেন মৃত্যু পর্যন্ত, ঈশ্বরলাভের জন্য — অত প্রেম তাঁর ঈশ্বরে, তখনই লোক বিচার করে, যিনি এর ভিতর এই অসাধারণ প্রেম প্রদান করেছেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রেমময়। এই কথাটি দিয়ে, অর্থাৎ সর্বত্যাগীর দৃষ্টান্ত দিয়ে, ঈশ্বরের প্রেমময়ত্বের কতকটা ধারণা হয়।

তাই সাধুকে মান দিতে হয়, পূজা করতে হয়। সাধুর পূজা আর ঈশ্বরের পূজা এক।

বড় জিতেন — এ কথা আজকাল লোক মানতে চায় না। তারা বলে, সাধু বসে বসে খায়। যারা খেটে খায় অথচ দরিদ্র, তাদের দাও।

শ্রীম — আমরা পলিটিশিয়ানদের কথা বলছি না। আমরা বলছি, বেদ, উপনিষদ, অবতার মহাপুরুষদের কথা। যারা ঐ কথা বলে, তাদের এই কথার মূলে ঐ — মানুষ সব সমান, All men are equal.

তুমি যদি কাপড় কিনতে বাজারে যাও, তখন কি তুমি চালের দোকানে কাপড় কিনতে যাও, কি কাপড়ের দোকানে যাও? তেমনি যদি তুমি ঈশ্বরকে চাও, তা হলে যে ঈশ্বরকে নিয়ে ব্যাপার করে তার কাছেই যাবে। অবতার ঋষি মহাপুরুষদের কাছে যেতে হবে। সর্বত্যাগী সাধু ঈশ্বরের ব্যাপারী।

হাঁ, তবে যদি নারায়ণবুদ্ধিতে, ঈশ্বরবুদ্ধিতে দরিদ্রকে দাও, সেটা হয় পূজা। তাতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হবে। তখন সেই শুদ্ধ চিত্তে ভগবান দর্শন হবে। এটা নিষ্কাম কর্মের পথ। দরিদ্রকে নারায়ণরূপে দেখার জন্যও তোমাকে সাধুর কাছে যেতে হবে।

কেবল দরিদ্রবুদ্ধিতে যদি দাও, তবে বোঝা যাবে তোমার দয়া আছে। দয়ার ফল পাবে। সুনাম হবে। কিন্তু ওরও উপরে সেবা। ঈশ্বরই এই রূপে রয়েছেন। তাই ঈশ্বরের সেবা দরিদ্র-নারায়ণে। রাম ও জনক প্রজাপালন করেছিলেন ব্রহ্মবুদ্ধিতে, জীব শিব — এই বুদ্ধিতে।

বিদ্যাসাগর মশায়কে এই কথাই বলতে গিছলেন ঠাকুর। বলেছিলেন, এ দয়ার কর্ম, পরোপকার যদি নিষ্কামভাবে করা যায় তা হলে ঈশ্বরলাভ হয়। বলেছিলেন, তোমার ভিতর মানিক আছে। অল্প একটু আবরণ আছে এর ওপর। ওখানে যেও, ওটা সরিয়ে দেব। তখন মানিক বের হয়ে পড়বে। অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হবে।

কেবল রোজগার কর আর খাও, এর চাইতে বড় সকাম দান। তার চাইতে বড় পরোপকার, দয়ার দান। তার চাইতে বড় সেবার দান। সেবার দান নিষ্কাম; তাই তাতে ঈশ্বরলাভ হয়, তাই সেটা সকলের বড়।

কেন ঈশ্বরলাভ বড়? এতে যে সর্বদুঃখ বিনাশ হয়। সর্বাবস্থায় মনে সুখ-শান্তি-আনন্দ থাকে। দয়ার কার্যে যে আনন্দ, তা সর্বাবস্থায় থাকে না। যাতে আনন্দ সর্বাবস্থায় উপভোগ হয় তার জন্যই সেবা — ঈশ্বরবুদ্ধিতে সেবা।

যাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি, অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শন, তাদের (সাধুদের) সেবা করতেই হবে। তাদের কাছেই সাধুসেবা, সাধুর পূজা, আর ঈশ্বরের পূজা এক।

একজন ভক্ত — সাধু যদি খারাপ কাজ করে তবে তাকে খারাপ বলবে না লোকে? — যদি চুরি করে?

শ্রীম — হাঁ, যদি caught red-handed হয় (হাতে নাতে ধরা পড়ে), তা হলে এক কথা। ঘটি চুরি করবার সময় যদি ধরা পড়ে তবে অবশ্য ভাববার কথা। তা হলেও ঘটিটা নিয়েই ছেড়ে দিতে হয়।

বড় জিতেন — সিলেটের ভক্তটি একটু এলোমেলো। সেদিন দেখি

ছাতাটা উলটিয়ে মাথায় হাত দিয়ে চলেছে।

শ্রীম (উত্তেজিত ভাবে) — তা কেন করবে না? যে বিয়ে করে নি, তার অযুত হস্তীর বল। সে কেন conventionalism (সামাজিক নিয়মানুগত্য) মানবে? কারো তো তোয়াক্কা রাখে না সে। অন্য লোক কি করে? টাকাকড়ি, মেয়েমানুষ, লোকমান্যের দাস হয়ে আছে। আর সাধু এ সব ছেড়েছে কাকবিষ্ঠাবৎ। সাধু কার ধার ধারে?

সাধুর সমালোচনা সামান্য হইলেও শ্রীম-র নিকট অসহ্য।

শ্রীম (জগবন্ধুর প্রতি) — হাঁ, আজ আবার জন্মাষ্টমী। কথামৃত একটু পাঠ হোক — আমাদের বাৎসরিক লীলামহোৎসব।

কিছুদিন ধরিয়া শ্রীম, যে তারিখ যে দিনে কথামৃত পাঠ হয়, ঠাকুরের সময়কার সেই দিনের সেই তারিখের ঠাকুরের মহাবাণী ও লীলাবিবরণ পাঠ শুনিতেছেন। ইহাকে তিনি বাৎসরিক লীলা-মহোৎসব নামে অভিহিত করেন। তাই আজ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরের বিবরণ পাঠ হইতেছে। বড় অমূল্য পড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আছেন। তাঁহার গলার অসুখের সূত্রপাত হইয়াছে। তবুও দিবানিশি ভক্তদের কিসে কল্যাণ হয় তাহা লইয়া ব্যস্ত। তিনি বলেন, কিছুদিন নির্জনে তপস্যা ও সাধুসঙ্গ করিয়া ভক্তিলাভ করিয়া ভক্তগণ সংসারে থাকিলে সুখ-দুঃখে মন অত উদ্বেলিত হইবে না।

কামিনীকাঞ্চনে মন থাকিলে যত অশান্তি দুঃখ। মনকে কষ্ট করিয়া কুড়াইয়া আনিয়া ভগবানের পাদপদ্মে দেওয়া উচিত। তবেই শান্তি সুখ আনন্দ। ইহাকেই ভক্তি বলে। এই জন্য মানুষজন্ম। জীবের পুনর্জন্ম হয় কিনা, কাটোয়ার বৈষ্ণবের এই প্রশ্নের উত্তর গীতার কথা দিয়া বলিলেন, পুনর্জন্ম হয়। যে যা চিন্তা করে প্রাণত্যাগ করে সে তাই হয়। তবুও কুতর্ক করায় বলিলেন, তোমার এ সব কথা হীনবুদ্ধির কথা! মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করা। তাঁকে দর্শন করা। সংসারে আসাই আম খাবার জন্য (ব্রহ্মানন্দ উপভোগের জন্য)। তাহাকে আরো বলিলেন, আম খেতে এসেছ আম খাও। গাছপালার অত খবরে কাজ কি? তবুও বৈষ্ণব তর্ক করিতেছে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন। পুনরায় বলিলেন, যেসব কথা বইয়ে পড়েছো সেগুলি ধারণা কর নির্জনে গোপনে তপস্যা

ক'রে। কেবল বইয়ের কথা আওড়ালে কিছু হয় না। সিদ্ধি সিদ্ধি বলে চীৎকার করলে নেশা হয় না, পেটে পড়া চাই।

পাঠ চলিতেছে। গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্তব করিতেছেন। এক বৎসরের জন্য সেবাধিকার প্রার্থনা করিতেছেন।

একজন ভক্ত — গিরিশবাবু যে পূর্ণব্রহ্ম বললেন, এটা কি নিজের ধারণা বিশ্বাস, না মদের নেশার প্রলাপোক্তি?

শ্রীম — বিশ্বাস বলেই তো মনে হয়। ঠাকুর নিজেই বললেন, 'তোমার যে বিশ্বাসভক্তি'।

ঢং করে বললে ধোপে টেকে না। গিরিশবাবুর এই বিশ্বাস বাকী জীবন ছিল। এদিকে সিংহরাশি পুরুষ। কিন্তু ঠাকুরের কাছে, ভক্তদের কাছে যেন শিশু। তিনিই তো প্রথম অবতার বলে প্রচার করেন। ঠাকুর তাঁর এ কথা, অর্থাৎ 'ঠাকুর অবতার' গ্রহণ করেছেন, নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, গিরিশ যে অবতার বলে, তোর কি মনে হয়? আবার বলেছিলেন, গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস।

পাঠ শেষ হইল।

একজন ভক্ত — গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি, ভগবানবুদ্ধি হয় কি করে?

শ্রীম — যার হয়েছে এ বুদ্ধি, তার সঙ্গ করা, সেবা করা। সাধুসঙ্গ করা। আর কেঁদে কেঁদে বলা ভগবানকে, এটা বুঝিয়ে দাও। ঈশ্বরের দিকে যত এগুবে ততই বুঝতে পারবে — ঈশ্বরই গুরুর ভিতর দিয়ে শিষ্যের কাছে উপস্থিত। শক্তি একটাই, শরীর দুটো। সেই একই শক্তি কখনও গুরু, কখনও ইষ্ট।

গুরু অর্থ ঈশ্বর। তিনি অবতার হয়ে আসেন। তিনি জগৎগুরু। তাঁর এই শক্তি শিষ্যের ভিতর দিয়ে জগতে প্রকাশিত হয়। তাই ঠাকুর বলেছিলেন গুরুতে ইষ্টবুদ্ধি করতে হয়। মানুষ-বুদ্ধি করলে ছাই হবে। আর বলেছিলেন, ঈশ্বরদর্শনের উপায় গুরুবাক্যে বিশ্বাস — অবতারের বাক্যে। অবতার গুরু, ঠাকুর গুরু।

কলিকাতা, ২১ আগস্ট, ১৯২৪ খ্রীঃ।
৫ই ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী, ৫২।৯ পল।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
গুরুদ্বারায় শ্রীম

মর্টন স্কুলের চারতলা। শ্রীম আপন কক্ষে বিছানায় বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। মাথায় কম্ফোর্টার, গায়ে লাল-ইমলীর সাদা সুয়েটার। তার উপর ছাই রং-এর ওয়ার ফ্লানেলের ঢিলা-হাতা পাঞ্জাবী। শীতকাল, এখন ভোর চারটা। স্থির হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন। বাহ্য চেতনা নাই।

আজ ১লা জানুয়ারী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দিনে কল্পতরু সাজিয়া অনেকগুলি ভক্তকে ইষ্টদর্শন করাইয়াছিলেন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। শ্রীম-র মন ঐ ব্রহ্ম-দর্শনের অনুধ্যানে নিমগ্ন।

সাতটার সময় ঐ আসনে বসিয়াই গুন্‌গুন্‌ করিয়া তিনি গান গাহিতেছেন।

গান। গুরু কাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীন জনে অভয়চরণ-তরী দিয়ে।। ইত্যাদি।

গান। দয়াল গুরু বলে দাও রে সাঁতার।

গান। চল গুরু দু'জন যাই পারে।

এখন সকাল আটটা। এটর্নি বীরেন বসু মোটর লইয়া আসিয়াছেন। শ্রীম বিনয় ও বীরেনকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বর রওনা হইলেন। ফিরিলেন ঠাকুরবাড়িতে। এখন বেলা সাড়ে এগারটা।

আজ গড়ের মাঠে সৈন্যদের বাৎসরিক কুচকাওয়াজ। ঐ আনন্দ, হীন হইলেও শ্রীম ত্যাগ করেন নাই। তাই দুইজন ভক্তকে অতি প্রত্যুষে উহা দেখিতে পাঠাইলেন — (ছোট নলিনী ও অপর একজনকে)। রাত্রিতে সব সংবাদ লইবেন।

শ্রীম মধ্যাহ্নভোজন করিয়া ঠাকুরবাড়িতেই বিশ্রাম করিলেন। পরিবারবর্গ ঐ স্থানে। অপরাহ্ন চারটায় মর্টন স্কুলে ফিরিয়াছেন।

আজ কল্পতরু দিবস আর ১লা জানুয়ারী বলিয়া অফিস বন্ধ। তাই অনেক ভক্তসমাগম হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ প্রভৃতি

আসিয়াছেন। শুকলাল, মনোরঞ্জন, বড় জিতেন, ছোট জিতেন, দুর্গাপদ, ডাক্তার বক্সী, বিনয়, অমৃত, বড় ও ছোট অমূল্য, ললিত উকীল, জগবন্ধু, বলাই, গদাধর, বুদ্ধিরাম প্রভৃতি বহু ভক্ত সমাগম হইয়াছে।

প্রথমে বাহিরে ছাদে বসিলেন। পরে শীত বলিয়া, আলো আসিতেই চারতলার সিঁড়ির ঘরে বসিয়াছেন। সকলের সহিত শ্রীম ধ্যান করিতেছেন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পূর্বের শ্রী নাই, কষ্ট হয় দেখিলে — এই সব কথা ধ্যানান্তে হইতেছে। তবুও সেখানকার প্রতিটি ধুলিকণা পবিত্র। ঐ স্থান মহাতীর্থ। ভগবান সশরীরে ত্রিশ বৎসর ছিলেন ওখানে। এই সব কথা হইতেছে।

স্বামী মাধবানন্দ ও অন্য এক সঙ্গী সাধু প্রবেশ করিলেন। শ্রীম অতি স্নেহে তাঁহাকে নিজের পাশে বেঞ্চেতে বসাইলেন। ইনি মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। কুশল প্রশ্নাদির পর নানা কথা হইতেছে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি) — আপনারা মস্ত একটা কাজ করেছেন, ঠাকুরের life-টা (জীবনীটা) বের করে। বছর তিনেকের চেষ্টায় এটা হয়েছে। এটার খুব দরকার ছিল। তবে এখন নন-কোওপারেশানে সকলে ব্যস্ত। পলিটিশিয়ানরা too busy (অত্যন্ত ব্যস্ত)। দেখবার সময় নেই।

স্বামী মাধবানন্দ — তারা এ সব বিশ্বাস করে না।

শ্রীম — তা বটে। অনেকেই পছন্দ করে না। গান্ধী মহারাজ ফোরওয়ার্ডে কত বড় কথা লিখেছেন – 'His life enables us to see God face to face .... Ramakrishna was a living embodiment of godliness.' মানে, তাঁর জীবনচরিত শুনলে মনে হয় যেন ঈশ্বর হাতে এসে গেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় ভাবের জীবন্ত বিগ্রহ। কি কথা! গান্ধী মহারাজের মত কয়জনের এই insight (অন্তর্দৃষ্টি) আছে? অপর লোক এসব সম্বন্ধে হয়তো patronisingly (মুরুব্বিয়ানা করে) বলে।

আমরা যখন ব্রাহ্ম সমাজে ঈশ্বরের কথা শুনতাম তখন মনে হতো তিনি কত দূরে! ও মা, ঠাকুরের কাছে কথা শুনে মনে হতো যেন ঈশ্বর পাশে বসে আছেন, হাতের কাছে! গান্ধী মহারাজ তাঁকে দর্শন করেন

নাই, কিন্তু উচ্চ অনুভূতি আছে। কেমন ধরেছেন তিনি, দেখুন।

তা হবে না! ঠাকুর তো শুধু ঈশ্বরদর্শন করেন নাই। নিজে যে ঈশ্বর — অবতার! তাই তো যারা শুদ্ধচিত্ত তারা ধরতে পারে, বুঝতে পারে। আবার কতজনকে ঈশ্বরদর্শন করিয়েছেন।

স্বামী মাধবানন্দ — গান্ধীজী সব ছেড়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা করছেন, খুব sincere!

শ্রীম — তিনি যে ঠিক ঠিক কর্মযোগী। সব ভোগ ছেড়ে যে কর্ম করতে চেষ্টা করে তাকেই বলে কর্মযোগী। কত বড় যোগী পুরুষ! যোগী না হলে ঠিক ঠিক কাজ হয় না। সব করবো, কিন্তু benefit (ভোগ) নেবো না, এইটি যোগীপুরুষের ভাব। গান্ধীজীর কাজ ঠিক কাজ। দেশ কত উঠেছে!

শ্রীম কি ভাবিতেছেন। পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুরের Self-Government (স্বরাজ) হলো আত্মসংযম। এঁরা বলেন Independence (স্বাধীনতা)। ঠাকুরের ভাবও আলাদা, ভাষাও আলাদা।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ সাহস করিয়া রাজনীতির কথা তুলিয়াছেন। দেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলিতেছে। সর্বত্র এইসব আলোচনা, বড় বড় নেতারা জেলে যাইতেছেন। ঘরের কুলবধূও বাহির হইয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। দুই একজন ভক্ত কোমর বাঁধিয়া এই সব কথায় মত্ত। শ্রীম কৌশল করিয়া এই কথার স্রোত ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, এই সব কথা যেন কোচড়ের দাদ। একবার চুলকাতে আরম্ভ করলে আর রক্ষে নাই। শেষে নির্লজ্জ হয়ে দু'হাতে বেহুঁশ হয়ে চুলকাতে থাকে।

শ্রীম (স্বামী মাধবানন্দের প্রতি) — কিন্তু ঠাকুরের politics (রাজনীতি) ছিল ঐটুকু — (সহাস্যে) 'কুঁয়ার সিং বলে, ইংরেজ রাজা, সেলাম করতে হয়।' স্বামীজী নিবেদিবতাকে বলেছিলেন, I have nothing to do with politics (রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই)।

একজন ভক্ত — আচ্ছা, পলিটিক্সের (রাজনীতির) মধ্যে কত ত্যাগ

দেখা যাচ্ছে। কত দুঃখ বরণ করছেন এঁরা!

শ্রীম — হাঁ, পলিটিক্সের (রাজনীতির) মধ্যে ত্যাগ আছে নিশ্চয়। এই যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডে ম্যাকসুইনি। একানব্বই দিন, না কত দিন, খেলই না। শরীর ত্যাগ করে দিল। এ ত্যাগও সকাম। এ কেমন? যেমন, ছেলেরা স্কুলে না খেয়ে চলে এলো। কেন? না, একে দিয়েছে দুটো সন্দেশ, আর ওকে চারটে। এই জন্য রেগে না খেয়েই চলে গেল (সকলের হাস্য)।

এ হলো ভোগের জন্য ত্যাগ। কম ভোগ হচ্ছে, বেশী ভোগ পাবার জন্য। আর ঈশ্বরের জন্য ত্যাগ, সে অন্য কথা! গান্ধীজীর কাজ ঈশ্বরের জন্য। তাই 'রাম রাম' করেন। এর ভেতরও ভাল লোক আছে। সংখ্যায় খুব কম। বেশীর ভাগই ঐ সকাম।

মাদ্রাজের সুবিখ্যাত জজ সুব্রামণ্য আয়ারের কথা হইতেছে। ইনি অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও নাইট উপাধি ছাড়িয়াছেন। সম্প্রতি একজন একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার কথা মাধবানন্দজী বলিতেছেন। স্বামীজীর কথাও আছে।

শ্রীম — খুব interesting article (মজার প্রবন্ধ) তো! আমরা নূতন কথা একটা জানলুম। মাথার পাগড়ি ফেলে দিলেন। আর বললেন, আমায় arrest (গ্রেপ্তার) কর। স্বামীজী সম্বন্ধে এটি নূতন কথা শুনলাম। নরেন সেনও এইরূপ করেছিলেন ডাফরিনের সঙ্গে।

আজকাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে যা করছে দেশের লোক, তা শুনতে সকলের একটু ইচ্ছা হয় বই কি। খুব স্বাভাবিক। শেষ অবধি পেরে উঠবে না গভর্নমেন্ট। দেশের লোকেরই জয় হবে।

তিন মাস পূর্বে ঋষিকেশে জলপ্লাবনে প্রায় আড়াইশ' সাধু প্রাণত্যাগ করেন। ঝাড়িতে (বনে) থাকতেন কুটীর বেঁধে। কয়েক বছর ধরে বদ্রীনারায়ণের পথে একটা পাহাড়ের চূড়া ভেঙ্গে গিয়ে নদীর জল আটকে রাখে। গত অক্টোবরে হঠাৎ সেই জল পাহাড় ভাসিয়ে বেগে বার হয়ে যায়। তাতেই ঋষিকেশের ঐ দুর্ঘটনা হয়। অবশ্য সরকার পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। সাধুরা সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। কেউ কেউ শহরে চলে

গিছলেন। বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী, নাম সর্বেশ্বরানন্দজী, আর একজন ব্রহ্মচারী ভবানী চৈতন্য ওতে দেহত্যাগ করেন। ভবানী চৈতন্য এম.এ. পাশ ছিলেন। আর সন্ন্যাসী বেশ পণ্ডিত ছিলেন। আর একজন ব্রহ্মচারী ধীরেনও ছিলেন। তিনিও সুপণ্ডিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঈশান স্কলার'। তিনি সন্ধ্যায় ঝাড়ি ছেড়ে কৈলাশ আশ্রমের দিকে আশ্রয় নেন তাই বেঁচে গেছেন। পরে শোনা যায়, মঠের সাধু দুইজন ঈশ্বর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে কুটীরে আসনে বসেই ভেসে যান স্বেচ্ছায়।

এই সব কথা হইতেছে।

শ্রীম — বড় বড় পাথর সব জলে ভাসিয়ে এনেছে। তাতে ধাক্কা খেয়েই নাকি মরেছে বেশীর ভাগ।

মাধবানন্দ — তিনি মারলে রাখে কে?

শ্রীম — হাঁ। ঠাকুর কোলা ব্যাঙের গল্প বলেছিলেন। রামের তীরের খোঁচায় কোলা ব্যাঙ মুমূর্ষু — চেঁচায় নাই। রাম জিজ্ঞাসা করলে বলল, রাম, নিজে মারছেন এখন কার দোহাই দিব, তাই চেচাঁই না। সাপে ধরলে, 'রাম রক্ষা কর' বলে চীৎকার করি।

শ্রীম — আমরা যখন স্বর্গাশ্রমে ছিলাম সে সময়ও একবার জল বেড়েছিল। লোকক্ষয়ের কথা শুনি নাই। আমরা পূর্বে খবর পেয়ে অনেক দূর চলে যাই। চার পাঁচ ক্রোশ। ফিরে যখন এলুম তখন দেখতে পাচ্ছি যেখানে ড্যাঙ্গা ছিল সেখান দু'মানুষ জল। কে আর সাধুদের খবর নেয়! ঈশ্বর-ইচ্ছার উপর নির্ভর করে তাঁরা পড়ে আছেন।

স্বামী মাধবানন্দ — মিশনের তরফ থেকে কিছু কিছু কুটীর বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। (দুঃখিত হয়ে) আমাদের দেশের লোক এই ভাবেই সব যাবে। কে দেখছে? রাজার সেদিকে নজর নেই। এই রকম অবহেলার জন্যে ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ মহামারীতেই আমরা সব সাবাড় হবো।

শ্রীম — গান্ধী মহারাজের সঙ্গে দেশের লোকও যোগদান করছেও এই ভেবেই। এমনিও মরছে। না হয় লড়েই মরবো, এই ভেবে। সহ্যেরও সীমা আছে। স্বামীজী তাই কত দুঃখে বলেছিলেন, সরকারের অবহেলায় দেশের লোক driven to the neighbourhood of brutes (পশু প্রায় হয়েছে)। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, ঘর বাড়ি নাই। মানুষ

বলে ধারণাই যেন তাদের লোপ পেতে বসেছে! আবার দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী এ সব লেগেই আছে! কি দুর্দশা!

শ্রীম চুপ করিয়া আছেন। কি ভাবিতেছেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের কি দৃষ্টি! কি বুঝবো আমরা? তাঁর ঘরের শিকেতে সন্দেশ পচে যাচ্ছে হাঁড়ির ভিতর। তবুও যাকে তাকে দিবেন না। ভক্তরা গেলে বের করে নিজহাতে দিবেন। অপর লোক হয়তো বলবে, কি কৃপণ! কেন দেন নাই তিনিই জানেন। আমরা যতটা দেখেছি, মনে হয় তা'তে, দুষ্ট লোককে খাওয়ালে তার দুষ্কর্মের ফল পেতে হয়, এই জন্যে হয়তো। বলেছিলেন, কসাইয়ের গো-হত্যার পাপ যার বাড়িতে সে খেয়েছিল তাকে স্পর্শ করবে। এক শ্রাদ্ধ বাড়িতে অপরের সঙ্গে বসে কসাই খেয়েছিলো। তারপর গিয়ে গো-হত্যা করে।

কালীবাড়িতে কিছু বিশেষ পর্ব হলেই প্রসাদী থালা আসতো ঠাকুরের ঘরে। রোজই কিছু কিছু আসতো। ঐ দিনবিশেষে একবার থালা আনতে দেরী হওয়ায় চটর চটর করে খাজাঞ্চীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। বললেন, ও ঘরের বরাদ্দ থালাটা যায় নাই কেন? অত বেলা হলো? যোগেন স্বামী তখন ছেলেমানুষ। এই কথা শুনে ভাবলে 'আকরে টানছে'। মানে পূজারী বামুন। চালকলা বাঁধার অভ্যাস। এটা যায় নাই। কিন্তু তিনি তো অন্তর্যামী, বুঝতে পেরে বললেন, দেখ্ এখানে ভক্তরা সব আসে। তারা খেলে রাসমণির ধনের সার্থকতা হবে। তাই গিয়ে নিয়ে এলাম।

তাঁর দৈবী দৃষ্টি। আমরা কি বুঝবো তার?

এই কর্ম সব, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে না করলে তার জন্য ভুগতে হবে নিশ্চয়। তাঁ'তে ফল দিয়ে, নিজে benefit (লাভ) না নিয়ে করলে হয়। তাতেও যদি ভুল ত্রুটি হয়, তিনি এতে ধরেন না দোষ। তাইতো বলেছেন, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ' (গীতা ২/৪০)। ভক্ত এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে এসে তুলে নেন।

সাধুরা মিষ্টিমুখ করিয়া বিদায় লইলেন। শ্রীম অক্ষয়ের সহিত বীরেন বসুর মোটরে ১৭২ নং হ্যারিসন রোডের শিখ-সঙ্গতে গেলেন শ্রীগুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মোৎসব দেখিতে। রাত্রি প্রায় নয়টা।

২

মর্টন স্কুল। চারতলার ছাদ। সন্ধ্যা হইতে এখনও কিছু বাকী আছে। শ্রীম আপন কক্ষে অর্গলবদ্ধ হইয়া ধ্যান করিতেছিলেন। বাহিরে ছাদে আসিয়া দেখিলেন, বেঞ্চেতে কয়েকজন ভক্ত। ডাক্তার, বিনয়, ছোট জিতেন, বিজয়, মনোরঞ্জন, গদাধর, বুদ্ধিরাম, শান্তি, জগবন্ধু প্রভৃতি একত্রিত হইয়াছেন। আর একজন সাধুও বসা। ইনি যশোহর হইতে আসিয়াছেন। তাঁহার নাম স্বামী তারানন্দ। শ্রীম যুক্ত করে সাধুকে নমস্কার করিয়া দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া হাতমুখ ধুইতে তিনতলায় নামিয়া গেলেন। নিচে যাইবার পূর্বে পুনরায় অন্তেবাসীর কুটীরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলামৃতখানা লইয়া আসিয়া শান্তির হাতে দিলেন। বলিলেন, তুমি ততক্ষণ এঁকে (সাধুকে) পড়ে শোনাও এইখানটা। শান্তি চৈতন্যের সন্ন্যাস পড়িতেছেন।

আজ ২রা জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ, ১৮ই পৌষ শুক্রবার। শুক্লা অষ্টমী ৩৮।২৯ পল।

সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীম উপরে আসিলেন। সাধুর সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া ডাক্তারের গাড়িতে বিনয় ও ডাক্তারকে লইয়া শিখ-সঙ্গতে রওনা হইলেন মেছুয়াবাজার। ভক্তদেরও পরে আসিতে বলিলেন।

চিৎপুর রোডের কাছাকাছি। জগবন্ধু, ছোট জিতেন, গদাধর, বুদ্ধিরাম, মনোরঞ্জন, বিজয় প্রভৃতি হাঁটিয়া গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীম 'দরবারে'র সামনে দ্বিতলে বসিয়া আছেন বীরাসনে যুক্ত করে। ফুলের কি অপূর্ব সাজ! ঘরের ভিতর ফুলের ঘর। আর আলোর বন্যা। বিদ্যুতের আলোতে ঘর ঝলসিয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর ঘৃতেরও একটি প্রদীপ আছে। দেয়ালে রামসীতা, চৈতন্যসংকীর্তন প্রভৃতি ছবি রহিয়াছে। কিছুকাল পর শ্রীম উঠিয়া গিয়া উত্তরের ঘরখানাতে প্রবেশ করিলেন। এখানে রহিয়াছেন রাধাকৃষ্ণ, শিব, শালগ্রাম প্রভৃতি। শ্রীম ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। একজন সাধু বসিয়া আছেন — পূজারী। তিনি উঠিয়া সভক্ত শ্রীমকে তুলসী ও কিসমিস প্রসাদ দিলেন।

শ্রীম নিচে নামিয়া আসিয়া সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতেই অন্তেবাসী। তাঁহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিতেছেন —

আহা, ঠাকুর এমনি impetus (প্রেরণা) দিয়ে গিয়েছেন যে এমন সব জায়গায়ও তিনি আনছেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি impetus (প্রেরণা)? অন্তেবাসী ও শ্রীম একসঙ্গে উত্তর করিলেন, সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়, এই শিক্ষা।

মোটরের নিকটে শ্রীম আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এরা গিয়ে দর্শন করে আসুক। ড্রাইভার দর্শন করিতে গেল, আর ভক্তরাও বিদায় লইলেন। তাঁহারা পদব্রজে কটন স্ট্রীটের গুরুদ্বারায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীম পরে আসিলেন। সাদা পাগড়ী মাথায় একজন শিখ সাধু আরতি করিতেছেন গ্রন্থ সাহেবের — কর্পূরের আরতি। আরতি শেষ হইল। এইবার 'আরদাস' (স্তুতি) করিতেছেন আর একজন সাধু। তাঁহার মাথায় কাল পাগড়ী, কাঁধে ঝুলান 'কৃপাণ'।

প্রথম ভগৌতী সিমর কে গুরু নানক লই ধ্যায় ফির,
অঙ্গদ্ তে গুরু অমরদাস রামদাসে হোই সহায়ে;
অর্জুন হরিগোবিন্দ কো সিমরো শ্রীহরিরায়ে
শ্রীহরিকৃষ্ণ ধ্যায়ে জিস দিঠে সভ দুঃখ জায়ে,
গুরু তেগবাহাদুর সিমরিয়ে ঘর নৌ নিধি অধিধায়ে
শ্রীগুরুগোবিন্দসিংজী মহারাজ ধর্মবীর সভ-থাঁই হোই সহায়ে।

শ্রীমকে একটি বৃদ্ধ শিখ ভক্ত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহারাজকা দৌলতখানা কাহাঁ হ্যায়? (কোথায় থাকেন)। দুইজনে কিছু কথা হইল। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে সাধুদের ভিক্ষার ব্যবস্থা আছে কি? সাধু উত্তর করিলেন, হাঁ জী মহারাজ, সন্তোঁ কে লিয়ে পরসাদকা ইন্তজাম্ হ্যায়। লংগর খুলা হ্যায়।

শ্রীম দরবার সাহেবের (গুরুগ্রন্থসাহেবের) পশ্চাতে দেয়ালে বিলম্বিত অমৃতসরের 'হরমন্দিরের' (স্বর্ণমন্দির বা দরবার সাহেবের) ছবি দেখিতেছেন। বৃদ্ধ সন্তজীও উঠিয়া গেলেন। তিনি ঐ মন্দিরের ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। গুরু রামদাস করিয়াছেন, ইনি চতুর্থ গুরু। মহারাজা রণজিৎ সিং স্বর্ণ দ্বারা শ্বেত পাথরের মন্দির মুড়িয়া দিয়াছেন। শিখদের 'অকাল-তখ্‌ৎ' (পরব্রহ্মের গদী) ঐ স্থানে। ঐ স্থান হইতে যে হুকুম হইবে তাহা

সকল শিখদের মানিতে হয়। সেখানে চব্বিশ ঘন্টা পূজাপাঠ ও ভজন চলে।

শ্রীম-র মাথার চাদরটা পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ সাধু পুনরায় মাথায় তুলিয়া দিলেন। শিখদের গুরুদ্বারায় প্রবেশ করিলে মাথা ঢাকিয়া যাওয়া বিধি। মসজিদেও এইরূপ নিয়ম। সাধু শ্রীমকে বলিলেন, নয়া সাল হ্যায়, ইসলিয়ে মকান পুতাঈ হো রহা হ্যায়।

আর একজন শিখ ভক্ত আসিয়া শ্রীমকে অন্য একটি বড় ছবির নিকট লইয়া গেলেন। জাহাঙ্গীর ভারতীয় অনেক রাজাদের বন্দী করিয়াছে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ সিং তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলেন।

এইবার 'কড়া (হালুয়া) পরসাদ' আর কয়েক টুকরা পেয়ারা সকলের হাতে দিলেন। শ্রীম ও ভক্তগণ নিচের তলায় নামিয়া গেলেন। দোরগোড়ায় শ্রীম বলিলেন, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে একবার এসেছিলাম এইখানে। অনেক বদলে গেছে। শ্রীম এই মন্দিরে আজ তিন স্থানে তিনবার ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন।

ভক্তগণ পদব্রজে আসিয়া পৌঁছিলেন রাজা রাম সিং-এর বাড়ি ১৭২ নং হ্যারিসন রোড। এখানেও গুরুদ্বারায় উৎসব। আসিবার সময় শ্রীমকে ভক্তরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, উনিও ঐস্থানে যাইবেন কিনা? তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, হাঁ। কিন্তু ভক্তগণ রওনা হইলে মতের বদল হইল। শ্রীম ক্রস স্ট্রীট ৭৯ নম্বরে, বড় সঙ্গতে গেলেন।

রাজা রামসিং-এর বাড়ির গুরুদ্বারায় ভক্তগণ নিচে বসিয়া গুরু-গ্রন্থ পাঠ শুনিতেছেন। গ্রন্থী সিংহাসনের উপর দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী বসিয়া পড়িতেছেন। গুরুমুখী ভাষা। ব্রহ্মজ্ঞানী ও সৎসঙ্গের মহিমা পাঠ চলিতেছে — মহল্লা পাঁচ। অর্থাৎ পঞ্চম গুরু অর্জুনদেবের 'সুখমনী' পাঠ হইতেছে। কি মধুর সুর! যেমনি ভাব তেমনি ভাষা! ইহাই শিখদের 'গীতা' — ভক্তগণ নিত্য পাঠ করেন।

পাঠ হইতেছে ঃ সগল পুরখু মহি পুরখু প্রধানু।
সাধ সংগি জাকা মিঠে অভিমানু।।

* * *

সাধ কী মহিমা বরনৈ কউনু প্রাণী

নানক সাধ কী শোভা প্রভ মাহি সমানী।।

* * *

সাধ কী মহিমা বেদ ন জানহি। .....

নানক সাধ প্রভ ভেদুন ভাঈ ॥

পাঠক হিন্দী তরজমা করিয়া বলিতেছেন ঃ তিনিই পুরুষ-শ্রেষ্ঠ যাঁহার অভিমান সাধুসঙ্গ দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। ..... সাধুর মহিমা বর্ণনার শক্তি কাহার আছে? হে জীব, সাধু শোভাতে শ্রীভগবানের সমান। সাধুর মহিমা বেদও জানে না। .... হে ভাই, সাধু ও ভগবানে কোন ভেদ নাই।

শ্রীম একটু পর আসিয়া গুরুমন্দিরের বরাবর দক্ষিণ দিকের স্তম্ভের পাশে বসিয়াছেন। নিবিষ্ট হইয়া শুনিতেছেন। শ্রীম-র দক্ষিণ হস্তে ডাক্তার। পশ্চাতে ছোট নলিনী, বুদ্ধিরাম ও মনোরঞ্জন। বামদিকে গদাধর, বিনয়, ছোট জিতেন, বিজয় ও জগবন্ধু।

রাত্রি প্রায় আটটা। শ্রীম বিদায় লইতেছেন। প্রণাম করিয়া উঠিলে কর্মকর্তা একটি বৃদ্ধ শিখ ভক্ত আসিয়া করজোড়ে বলিতেছেন, "বিনতী হ্যায় কি, ইতয়ার কো দস্ গ্যারহ বজে জরুর দর্শন দেনা"। অখণ্ড পাঠ শীঘ্রই শেষ হইবে। বৃদ্ধ যুক্ত করে অভিবাদন করিলেন, 'সৎ শ্রী অকাল।'

মর্টন স্কুল, কলিকাতা ১লা জানুয়ারী, ১৯২৫ খ্রীঃ।
১৭ই পৌষ, ১৩৩১ সাল, বৃহস্পতিবার, শুক্লা সপ্তমী ৩৯।১০ পল।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

গুরু নানক ও অর্জুনদেব

মর্টন স্কুল। চারতলার কক্ষ। শ্রীম মাথায় কম্ফোর্টার, গায়ে সুয়েটার পরিয়া আলোয়ানে শরীর ঢাকিয়া বিছানার উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য। ধ্যান করিতেছেন। একটু পর আটটা বাজিল। দশটায় স্কুল বসিবে। বড়দিনের ছুটির পর গতকল্য স্কুল খুলিয়াছে। একটি ভক্ত-শিক্ষক গৃহে প্রবেশ করিলেন। কথা হইতেছে।

শ্রীম (শিক্ষকের প্রতি) — আচ্ছা, আপনি বক্তৃতা দেন না কেন, সৎপ্রসঙ্গ সভায়? ভাবছি, গোপেন বাবু আর আপনাকে এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী করা হবে; এ্যালাউন্স পাওয়া যাবে। গীতাও আপনারা পড়বেন।

শিক্ষক (বিনীতভাবে) — বক্তৃতা দিতে আমার লজ্জা হয়। নিজে পালন করছি না। আবার অপরকে বলা।

শ্রীম — কেন, সে তো এই বললেই হয় — ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। নিজের নাম নাই বা বলা হলো। আর, আমাদের এই করা উচিত, তাঁরা সব বলেছেন। তা হলে নিজেকেও বলা হলো, উপদেশ হলো না। এটা একটা art of teaching (শিক্ষাদানের কৌশল)।

গৃহে গোপেনের প্রবেশ।

শ্রীম (গোপেনের প্রতি) — হাঁ গোপেনবাবু, তোমাদের দু'জনকে সৎপ্রসঙ্গ সভায় বক্তৃতা দিতে হবে। (শিক্ষককে দেখাইয়া) এঁকে বললাম — প্রস্তুত হও। গীতা ভাগবত পাঠ — এ সবও তোমরা করবে। ভক্ত লোক পড়লে ভগবানের আবির্ভাব হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দু'ভাবে বলা যায় ঈশ্বরীয় কথা — গুরুভাবে আর সেবকভাবে। যাঁরা প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কাজ করেন তাঁরা গুরুভাবে উপদেশ দিতে পারেন। অপরদের সেবকভাবে করা উচিত। স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীরের সেবা। এ সব কথা কারণ-শরীরের আহার। আমাদের মঠের এই তিন রকমের সেবাই রয়েছে। হাসপাতাল ডিস্পেনসারী রিলিফ,

এ সব স্থূল-শরীরের সেবা। স্কুল কলেজ, এ সব সূক্ষ্ম-শরীরের সেবা। আবার কারণ-শরীরের সেবা, প্রচার। তাঁর নাম, তাঁর ভাব অপরকে বলা সেবকভাবে, গুরুভাবে নয়। ভগবান এইসব রূপে রয়েছেন। তাঁরই বাণী তাঁকে শোনাচ্ছি, আমি যন্ত্র মাত্র — এ ভাব আরোপ করলে দোষ হয় না। নিজেকেও include (অন্তর্ভুক্ত) করা হয়ে গেল। তখন তাঁর নাম-গুণ কীর্তন হয়ে গেল। দীন ভাব তখন আসে।

গোপেন শ্রীম-র দৌহিত্র। গৃহে ছোট জিতেন, গদাধর, বুদ্ধিরাম ও ছোট নলিনী রহিয়াছেন। সৎপ্রসঙ্গ সভা, মর্টন ইনস্টিটিউশানের ধর্মসভা, প্রতি রবিবার হয় সকালে। শিক্ষক ও ছাত্রগণ উপস্থিত থাকেন। গীতা ও ভাগবত পাঠ হয়। আর কোন নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা হয় ছেলেদের ও শিক্ষকদের। এই সভা হইতে বহু ছাত্র ও শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জানিতে পারিয়াছেন। অনেকে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। গোঁড়ামী নাই, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়বাণীর উপর উহার ভিত্তি। ক্রাইস্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবন ও শিক্ষার আলোচনা হয় অসাম্প্রদায়িক ভাবে।

অপরাহ্ন দুইটা বাজিয়াছে। স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছে। দোতলার সিঁড়ির পাশে বসিবার ঘর। শ্রীম সকল শিক্ষকগণের সহিত একত্রিত হইয়াছেন। Method of Teaching (শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে) আলোচনা হইতেছে। শ্রীম রেকটার এবং আজের Teachers' Conference-এর শিক্ষক-সভার চেয়ারম্যান। ইনি পশ্চিমের দেওয়ালে পিছন দিয়া চেয়ারে বসা। ওয়ার ফ্লানেলের পাঞ্জাবী গায়ে। কাঁধের উপর ভাঁজ করা সাদা পশমী চাদর। শিক্ষকগণ সকলে বেঞ্চেতে বসা। শ্রীম-র সামনে পূর্ব সারিতে শচীন্দ্র, দেবেন্দ্র, কাঙ্গালী, হরেন, মণি, জগত্তারণ ও ছোট হরিপদ বসিয়াছেন। উত্তরমুখী তিন সারি বেঞ্চ শ্রীম-র ডান হাতে। তাহার প্রথম সারিতে বসিয়াছেন বড় হরিপদ, কেশব ও জগবন্ধু। তাঁহার পিছনের সারিতে বিমল ও গোপেন। সকলের পিছনে জ্ঞান, গৌরী ও পূর্ণ।

শ্রীম তাঁহার স্কুলে কিছুদিন হইতে বাংলায় সব বিষয় পড়াইবার প্রথার প্রবর্তন করিয়াছেন। সুচিন্তিত ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ কতকগুলি শিক্ষার উচ্চ ভাব সারকুলার বইয়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাই হেড মাস্টার বড়

হরিপদ পড়িয়া শুনাইতেছেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথম — চরিত্র সংগঠন, আর দ্বিতীয় — বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ। ইংরাজী পড়াইবার আগে বাংলায় গল্প বা কবিতার ভাবটা বলিয়া দিতে হয়। আর মাঝে মাঝে দুই একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। ইতিহাস পড়াইবার সময় ম্যাপ দেখাইতে হয়, ভূগোলে তো দেখাইতেই হইবে। সাহিত্যেও তাহাই দেখাইতে হয়। ইহাতে ছেলের মনে থাকিবে বেশী, অথচ চাপ পড়িবে না। 'History is Philosophy taught by example' (শ্রেষ্ঠ পুরুষের জীবনীর মাধ্যমে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার নামই ইতিহাস)। হিস্ট্রির moral (উপদেশ) বলিয়া দিতে হয়। Poetry (কবিতা) মুখস্থ করাইতে হয়। টনি সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতেন, আর বলিতেন, এ কি রকম poetry (কবিতা) পড়া হচ্ছে? — কিন্তু মুখস্থ করা হয় না। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত সব poetry (কবিতা) মুখস্থ করানো চাই।

দুইটি আছে — একটি শব্দার্থ, আর একটি মর্মার্থ – language and thought — আমরা thought (মর্মার্থ) দিতে চেষ্টা করিতেছি। ইহার জন্য যতটা language-এর (ভাষার) দরকার তাহা শিখান।

জাপানে সব vernacular-এ (মাতৃভাষায়) শিখান হয়। ইহাতে thought clear (ভাবধারা বিশুদ্ধ) হয়। এমন কি সায়েন্স এবং ফিলজফি পর্যন্ত জাপানে মাতৃভাষায় পড়ান হয়। ইংরেজী ওখানে optional (স্বেচ্ছামূলক)।

দুইটা বাজিয়া চল্লিশ মিনিটে সভাভঙ্গ হয়।

এখন বেলা তিনটা। ছাদে ভক্তগণ সমবেত হইয়াছেন। জগবন্ধু দক্ষিণ দিকে বেঞ্চের উপর লম্বমান হইয়া বিশ্রাম করিতেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গদাধর বসিয়া কিছু পড়িতেছেন। বুদ্ধিরাম পাশের টিনের ঘরে বসিয়া জপ করিতেছেন। আর বিনয় একটা গদী বাঁধিতেছেন। শ্রীম স্বীয় কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন। সুখেন্দু এইমাত্র আসিলেন।

চারিটার সময় শ্রীম ছাদে আসিলেন, হাতে বিদ্যাপীঠের rules and regulations-এর (নিয়মাবলীর) খসড়া। বিদ্যাপীঠের প্রারম্ভ হইতে শ্রীম-র স্নেহদৃষ্টি উহার উপর রহিয়াছে। আরম্ভের সময় তিনি মিহিজামে

গিয়া সাত আট মাস বাস করেন। উহার যাবতীয় কার্য শ্রীম-র সহিত পরামর্শ করিয়া হয়। নিয়মাবলীর খসড়া শ্রীম দেখিয়া কথঞ্চিৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীম-র হাতে এই খসড়া।

শ্রীম (গদাধরের প্রতি) — জগবন্ধু ঘুম থেকে উঠলে বলবে, এইটে বিদ্যাপীঠে পাঠাতে হবে। আগে উঠলে পরে বলবে। কি বললাম বল দিকিন?

গদাধর — ঘুম থেকে যখন উঠবেন তখন বলবো এইটে বিদ্যাপীঠে পাঠাতে — দেওঘর।

শ্রীম — হাঁ, এটা পাঠাতে বলবার জন্য ঘুম থেকে ওঠাবে না, বুঝলে? (জনান্তিকে সহাস্যে) আর যদি উনি শুনে থাকেন — (শ্রীম ও ভক্তগণের উচ্চহাস্য)। জগবন্ধুও সেই হাস্যরোলে যোগদান করিলেন।

জগবন্ধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। তিনি সব শুনিতেছিলেন, উঠিয়া ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। সুখেন্দু ডাকে ফেলিতে গেলেন।

এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। ভাটপাড়ার ললিত, ভোলানাথ, বসন্ত প্রভৃতি শনিবারের ভক্তগণ আসিয়াছেন। ছাদে দক্ষিণ-পূর্ব ধারে আর্চের পাশে বসিয়া আছেন। শ্রীম ঘর হইতে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। পরস্পর নমস্কারাদি হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিজয়, ছোট নলিনী, ছোট জিতেন প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জগবন্ধু, সুখেন্দু, বিনয়, গদাধর, বুদ্ধিরাম পূর্ব হইতেই বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসায় ছোট জিতেনের বাড়ির অসুখ বিসুখের সংবাদ জানিয়া তাঁহাকে রানাঘাটের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। ইনি কলিকাতায় থাকেন ও ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কেশিয়ার। এইবার শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ললিত প্রভৃতির প্রতি) — আমরা কাল শিখদের ওখানে গিছলাম। চার জায়গায় — মেছুয়াবাজার, কটন স্ট্রীট, ক্রস স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডে। গুরুগোবিন্দ সিং-এর জন্মোৎসব। আহা, কি সুন্দর করে সব সাজিয়েছে! ফুলের সাজ একখানে। কত ভক্তি শ্রদ্ধা! গুরুদ্বারই বটে! গুরু মানে ভগবান। গুরুর উপর ভক্তি এলে বুঝতে হবে ভগবানের উপর ভক্তি এলো। গুরু আর ইষ্ট অভেদ। শিখদের গুরুগণের উপর অতিশয়

শ্রদ্ধা। হিন্দুমাত্রেরই শ্রদ্ধা আছে। গুরুগণ এ সময় না এলে, পাঞ্জাবে হিন্দুধর্মের নামগন্ধ থাকতো না। সব মুসলমান হয়ে যেতো। জোর করে সব convert (মুসলমানধর্মে দীক্ষিত) করতো কি না। প্রতিবাদ করায় গুরু অর্জুনদেবকে জাহাঙ্গীর মেরেই ফেললেন। জাহাঙ্গীর বলেছিলেন, হয় তাকে মুসলমান পীর করতে হবে নচেৎ শেষ করতে হবে। তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি, নিষ্কাম কর্ম, গভীর ত্যাগ, ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস, মহান হৃদয়, দেশপ্রীতি ও ধর্মবিশ্বাস, আর উজ্জ্বল জ্ঞান ও যোগশক্তি দেখে হিন্দুগণ তাঁর আশ্রয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছিলেন। রাজরাজরা পর্যন্ত তাঁর সহায়তা ও পরামর্শ নিতেন। ইনিই প্রথম সঙ্ঘবদ্ধের চেষ্টা করেন শিখদের। গুরুগ্রন্থসাহেব তাঁহার রচনা ও অমর কীর্তি। আহা কি সব কথা শোনা গেল কাল। প্রাণ শীতল হয়ে যায়। যেমন গাম্ভীর্য তেমনি প্রেম। গুরুমুখী ভাষার অক্ষর ছিল না। ইনি তার আবিষ্কার করলেন, বড়ই নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে রাজ-আজ্ঞায় হত্যা করা হয় লাহোরে। একটা ডেকচির ভিতর বসিয়ে নিচে আগুন জ্বেলে দেয়। আর মাথার উপর তপ্ত বালি ঢেলে দেয়। অত অত্যাচারেও জ্ঞান ও ভগবানে বিশ্বাস অটুট ছিল। অমৃতসর ও তরণতারণে তাঁর অমর কীর্তিগাথার ঘরে ঘরে কীর্তন হয়।

'সুখমনী' পাঠ কাল শুনলাম। কি মধুর ভাষা ও ভাব। গুরু অর্জুনদেবের রচিত। গীতার মত এর পাঠও সুর করে কীর্তন রোজ ঘরে ঘরে হয়। উনি গানেরও একজন বড় authority (অধিকারী) ছিলেন মনে হয়। কারণ গুরুগ্রন্থসাহেবের বাণী সব গাওয়া হয় উচ্চ classical (উত্তম পৌরাণিক) রাগে। সাধুসঙ্গের কি মহিমাই কীর্তন করেছেন সুখমনীতে। আর নাম-মাহাত্ম্য। মানে, রূপের মাহাত্ম্য। সমস্ত গুরুগ্রন্থসাহেবই সাধুসঙ্গ ও সেবার কথায় পরিপূর্ণ। তাই পাঞ্জাবে অত সাধুভক্তি ও সাধুসেবা।

গুরু নানক অবশ্য এর প্রধান প্রবর্তক। গুরু নানককে ঈশ্বরের অবতার বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। বছর ষোল বড় ছিলেন। (সহাস্যে) ঠাকুর কখনো বলতেন — শিখরা বলে, তুমিই গুরু নানক। ওরা সব আসতো কিনা, দমদমার শিখ-সৈন্য ভক্তগণ। তাঁদের জন্য মা'র কাছে ঠাকুর কেঁদে প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা, এদের কল্যাণ করো'। দু'চার ঘন্টার ছুটি পেলেই ছুটে আসতো। তাই মাকে বলেছেন,

'মা, এদের কল্যাণ করতেই হবে। দেখ, এরা তোমার কাছে ছুটে ছুটে চলে আসে। এতো ব্যাকুল!'

ঈশ্বরের শক্তি যেখানে ঠিক ঠিক প্রকাশ, সেখানেই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা। ধর্মের বাহ্য আচরণ চিরকাল আছে ও থাকবে। কিন্তু অবতার এলে ব্যাকুলতা বাড়ে। এটি নূতন জিনিস। আবার ধীরে ধীরে চলে যায়।

আমি একবার শিখদের পাড়ায় গিয়ে পড়েছিলাম কুরুক্ষেত্রে। এক বাড়িতে অতিথি হলাম। আহারাদি সব হল। ওরা বড়ই অতিথি-সেবাপরায়ণ। এটিও গুরুদের অন্যতম শিক্ষা। কুরুক্ষেত্র পাঞ্জাবে কি না।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন — পুনরায় ক্ষীণস্বরে কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভোলানাথের প্রতি) — আপনার তীর্থে ঘোরার ইচ্ছা হয়? ঠাকুর বেশী বলতেন না তীর্থের কথা। বলেছিলেন, কাশী আর বৃন্দাবন, এ হলেই যথেষ্ট। একটি জ্ঞানের, অপরটি ভক্তির স্থান। যাদের খুব তীর্থপ্রীতি ছিল তাদের বলেছিলেন এ কথা। বলেছিলেন, 'বল দিকিন, এটা আমার কেমন হলো? ভক্তরা তীর্থে যেতে চাইলে আমি মত দিই না। তারা ইচ্ছা করে তাদের মতে মত দি।' ভক্তরা কি করে বুঝবে তাঁকে! তিনি নিজেকে নিজেই জানতেন। জানতেন, 'কি করবে তীর্থে গিয়ে আমাকে ছেড়ে'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাই বলেছিলেন জিজ্ঞাসা করায়, 'কোথাও দেখলাম এক আনা, কোথাও দুই আনা। এখানে (ঠাকুরের কাছে) ষোল আনা (ঈশ্বরীয় প্রকাশ)'।

তীর্থেও তাঁরই প্রকাশ।

তিনিই যখন কোন স্থানকে অবলম্বন করে প্রকট হন তাকেই তীর্থ বলে। আর মানুষ-শরীর ধারণ করলে বলে অবতার। তীর্থও বরাবর আছে। যদি অবতারকে পায়, তবে কেন যায় ঘুরে মরতে তীর্থে? তাঁকে পাওয়া তাঁকে চেনা, বড় কষ্ট। কাছে থাকলেও বোঝা যাবার যো নাই। তাঁর মায়ার আবরণে তিনি ঢাকা। যদি কৃপা করে একটু আধটু বুঝিয়ে দেন তবেই ধরতে পারে। ধরা না দিলে ধরা যায় না।

(দৃষ্টি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া) কই, তিনি থাকতে কে তেমন তীর্থে গেছে?

ললিত — স্বামীজী বুদ্ধগয়ায় গিছলেন।

শ্রীম — হাঁ, সে পাঁচ ছয়দিনের জন্য।

ললিত — রাখাল মহারাজ মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে —

শ্রীম — হাঁ, একবার। যখন দেখলেন থাকবে না, তখন পাঠিয়ে দিলেন। মাকে বলেছিলেন, 'ডুবাস্ নে যেন মা'। হাঁ, সুরেশবাবু কুম্ভে গিছলেন প্রয়াগে, সঙ্গে ছিল আর. মিত্র। বলরামবাবু বৃন্দাবনে গিছলেন।

শীতকাল। বাহিরে হিম পড়িতেছে সন্ধ্যা হইয়াছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — চলুন, ঘরে গিয়ে বসি।

ভক্তগণ উঠিয়া সিঁড়ির ঘরে গেলেন। সকলে ধ্যান করিতেছেন। একজন ভক্ত পাশের টিনের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন ঁকাশীর বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতির কথা। পুনরায় কথা হইতেছে। বড় জিতেন, ডাক্তার প্রভৃতি আসিয়াছেন। ললিত প্রভৃতি বিদায় লইলেন।

শ্রীম বসিয়াছেন জোড়া বেঞ্চে সতরঞ্চির উপর, দক্ষিণাস্য। তাঁহার পাশে পূর্বদিকের বেঞ্চেতে বসা বড় জিতেন, রমণী ও গদাধর। সামনাসামনি অন্য সারিতে বসিয়াছেন উত্তরাস্য — সুখেন্দু, 'ব্রুকবন্ড' (যতীন), বলাই, মনোরঞ্জন, ডাক্তার, বিনয়, বুদ্ধিরাম, জগবন্ধু প্রভৃতি। ডাক্তার শ্রীম-র হাতে একখানা 'সুখমনী সাহেব' আনিয়া দিলেন — গুরুমুখীর বাংলা তরজমাসহ। শ্রীম পুস্তকখানি হাতে করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন। এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর আমাদের নানান খানে নিয়ে যাচ্ছেন কেন? দেখাতে, তিনিই সব হয়ে আছেন। শিখদের যে উৎসব তা-ও তিনিই। উৎসবানন্দও তিনি, যাঁর জন্য হচ্ছে (গুরু গোবিন্দ সিং) তিনিও তিনি। আর যাঁরা করছেন তাঁরাও তিনি। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, 'আমি দেখছি মা-ই সব হয়ে রয়েছেন'। আবার কখনও বলতেন, 'এ খোলটার ভিতর মা এসে গেছেন।' অর্থাৎ ঠাকুর ব্রহ্মশক্তির অবতার।

আমাদের চোখে এই চশমাটি পরিয়ে দিয়েছেন। তাই সব লাল দেখা যাচ্ছে, সব আপনার বলে মনে হচ্ছে। কাল গুরুদ্বারে গিয়ে মনে হলো যেন অমৃতসরে গিয়েছি। অমৃতসরে দরবার সাহেবে দিনে রাতে উৎসবানন্দ। কি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে সব মাতিয়ে রেখেছেন। দিনরাত পূজা পাঠ, আরতি ভজন, আবার প্রসাদ বিতরণ, কড়া প্রসাদ। পঞ্চভূতে জীব আবদ্ধ

হয়। আবার তা দিয়েই মুক্তও হয়। তাঁর দিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ — এ সবগুলি দিয়ে তাঁর পূজা। কি রকম সব ফুলের সাজ দেখা গেল গুরুদ্বারায়। মানুষ যা ভালবাসে তাই তাঁকে দেওয়া। তাঁকে দিয়ে প্রসাদরূপে ভোগ করলে ক্রমে মুক্তি হবে। নিজে ভোগ করলে বন্ধন বাড়বেই খালি।

শ্রীম 'সুখমনী' খুলিয়া মাঝে মাঝে পড়িতেছেন। এইবার অষ্টম সর্গ। ব্রহ্মজ্ঞানীর লক্ষণ।

শ্রীম — ব্রহম গিআনী সদা নিরলেপ।।
জৈসে জল মহি কমল অলেপ।।
ব্রহম গিআনী সদা নিরদেখি।।
জৈসে সুরু সরব কউ সেখি।।
ব্রহম গিআনী কৈ দৃসটি সমানী।।
জৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পবান।।
ব্রহম গিআনী কৈ ধীরজু এক।।
জিউ বসুধা কোউ খোদৈ কোউ চন্দনলেপ।।
ব্রহম গিআনী কাইহৈ গুনাউ।।
নানক জিউ পাবক কা সহজ সুভাউ।।

বাংলা পড়িলেন — ব্রহ্মজ্ঞানী সদা নির্লেপ, যেমন পদ্মপত্রস্থ জল। সূর্য যেমন ভালমন্দ সকলকেই উত্তাপ দেয় কিন্তু নিজে সদা পবিত্র — ব্রহ্মজ্ঞানী তেমনি নির্দোষ। পবন যেরূপে রাজা ও ক্রীতদাস উভয়কে সমানভাবে স্পর্শ করে, ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টি তেমনি সকলের উপর সমান। ধরিত্রীকে খুদ কিম্বা চন্দন দিয়ে পূজা কর — তার ধৈর্যের সীমা কখনো লঙ্ঘন করতে পারে না, তেমনি ধীর ব্রহ্মজ্ঞানী। অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বপাবক।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — এই যা পড়া হলো সব ঠাকুরে দেখেছি। অন্তরঙ্গদের উপর যে দৃষ্টি, 'রস্‌কে' (রসিক) মেথরের উপরও সেই দৃষ্টি। রতির মা বেশ্যাকেও মায়ের রূপে দেখে প্রণাম করতেন। রাজমিস্ত্রির কাজে যোগান দিত একটি কালো পশ্চিমা মেয়ে। তাকে মায়ের রূপে দেখে নমস্কার করলেন। গিরিশবাবুর সব পাপ নিয়ে শুদ্ধ

করে দিলেন।

তাঁর কাছে এলে গেলেই হয়ে যেতো। জলে নাইলে যেমন শরীরের ময়লা যায় — তেমনি, ইঙ্গিতে বলতেন, এখানে এলে-গেলেই মনের ময়লা দূর হবে। জপ তপ করতে বলতেন, কিন্তু তত জোর দিতেন না। কিন্তু আনাগোনা করতে খুব জোরে বলতেন।

(সহাস্যে) পূর্ব-দক্ষিণ বারান্দায় একদিন হাজরা মালা জপ করছিল। ঠাকুর ভাবাবস্থায় হাত থেকে মালা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এখানে এসেও মালা জপা?' মানে এখানে একেবারে উদ্দীপন হয়ে যাবে। সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে তাঁর। ঈশ্বরদর্শনের জন্য জপ টপ সব। নিজে তিনি উপস্থিত সশরীরে। তবে এ সবের দরকার কি এখন, এই ভাব।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বেদে আছে, ব্রহ্মকে অনুভূতি করা যায়। ঠাকুর বলতেন, শুধু অনুভূতি নয়। সাক্ষাতে রূপ ধরে আসেন, কথা কন। আবার সেই কথা সকলকে বলছেন ঠাকুর। এক ঘর লোক বসা, সবই প্রায় sceptic (নাস্তিক)। বিজয় গোস্বামীও আছেন। ঠাকুর বলছেন, 'মাইরি বলছি, — মা এসেছেন।' আবার মাকে বললেন, 'বা, তুমি যে লাল পেড়ে শাড়ী পরে এসেছো, আবার চাবি কাঁধের উপর ঝুলিয়েছ।'

দর্শন, স্পর্শন, কথন। শুধু দর্শন নয়।

ব্রাহ্ম সমাজের এরা বলতো, এ সব মনের ভ্রম – hallucination. তা শুনে ঠাকুর বললেন, 'তা কেমন করে হয়? মা যা বলেন তা যে সব মিলে যাচ্ছে!' ভক্তদের যা সব ঠাকুর বলতেন, তাই হতো। তা'তেই বললেন এই কথা। মনের ভ্রম হলে তা আবার সত্য হয় কি করে? একদিন তো নয় বরাবর যা বলেছেন সবই মিলে গেছে। একটিও অমিল হয় নাই আজ পর্যন্ত। তা হবে কি করে? বলতেন যে, আমার মুখ দিয়ে মা কথা কন। তা হলে কি করে ভুল হবে? ভগবানের কথা কি ভুল হতে পারে?

শ্রীম (একটি বালক ভক্তের প্রতি) — দেখলে, তিনি কত জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন! ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীস্টান, বৌদ্ধ আবার নানকপন্থী সকলের কাছে পাঠাচ্ছেন। আর হিন্দুদের নানান খানে তো পাঠাচ্ছেনই। এই সব

দেখে শেষে এক জায়গায় বসে তাঁর নাম করা। খালি কি উপরের ফল খেলে হয়? নিচের ফলও খেতে হয়। সর্বদা চোখ বুজে থাকলে কি হবে! সবই দেখতে হয়।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একটি পাখী অন্যমনস্ক হয়ে একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর বসে ছিল। জাহাজ সাগরে চলে গেছে। তখন তার চৈতন্য হলো। আর পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কোথাও ড্যাঙ্গা পেল না — যেখানে ফলফুল হয়। শেষে ক্লান্ত হয়ে ঐ মাস্তুলেই বসে রইল। তেমনি সব দেখা। দেখতে দেখতে ডানা ব্যথা হলে তখন এক জায়গায় বসে তাঁর নাম করা।

দাঁড়াচ্ছে এই, সবই আদ্যাশক্তি থেকে হয়েছে। আদ্যাশক্তিই এই সব দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ জগৎ মনে। আদ্যাশক্তি অন্তরে, আবার বাহিরে। তিনিই বুদ্ধিকে চালনা করেন অন্তরে থেকে। তবেই মানুষ করতে পারে। যে এটা জেনে করে তাকেই জ্ঞানী বলে।

এক মত আছে, এই সবই মনে ছিল। বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদও এইরূপ। নাগার্জুন শূন্যবাদ প্রচার করেছিলেন ফার্স্ট সেনচুরিতে। ওটার ভিত্তি ছিল বুদ্ধদেবের একটি বাণী — 'সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং শূন্যং শূন্যং'; এটা বেদান্তের 'জগৎ মিথ্যা'র অনুরূপ। এরূপ প্রচারের কারণও ছিল। বুদ্ধদেবের প্রায় পাঁচশ' বছর পর বৌদ্ধ ধর্মে বেশ মলিনতা ঢুকেছিল। এটার কারণ হয়তো অশোকের Aggressive Buddhism (উৎকট গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মপ্রচার)। তখন একটা reaction (প্রতিক্রিয়া) এসেছিল। তখন এলেন নাগার্জুন। তিনি এটাকে ঝেড়ে ঝুড়ে উঠিয়ে দিলেন উপরে। জগৎ 'শূন্যং শূন্যং' প্রচার করলেন। দু'শো বছর ঐ মতটা জোরে চললো। কিন্তু অত উঁচুতে মন রাখতে পারলে না ভক্তরা। তাই থার্ড সেনচুরিতে এলেন, অসঙ্গ আর বসুবন্ধু। এঁরা এসে বললেন, জগৎ মনে। মনেরই সৃষ্টি এটা। অনেকদিন এই মত চলেছিল। হিউয়েন সাং এই মতের লোক। খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন। যেমনি পণ্ডিত তেমনি উঁচু সাধু ছিলেন তিনি। মহাপুরুষ লোক।

ইদানিং কালের 'বারক্‌লে'র আইডিয়ালিজমও (Berkeley's Idealism) বিজ্ঞানবাদের সমর্থক।

কিন্তু ঠাকুরের ব্যাপার আলাদা। তিনি যখন এইসব জগৎলীলা দেখতেন তখন 'মা, মা' বলে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। দেখতেন কি না, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। মা-ই সব চালাচ্ছেন জীবের বুদ্ধিটাকে ধরে। সমাধি মানে কি? না, এই সবই তাঁর থেকেই হয়েছে, এইটে দেখা।

শ্রীম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — গুরু নানক একজন shop-boy (দোকানের কর্মচারী) ছিলেন। তাঁর ভগ্নীপতির দোকানে কাজ করতেন। খুব অল্প বয়স। মুদীর দোকান। একদিন কতকগুলি সাধু যাচ্ছেন। তাঁদের ডেকে এনে আটা অমনি দিয়ে দিলেন। ভগ্নীপতি জানতে পেরে তাড়না করলেন। বললেন, অমনি করলে দোকান চলবে কি করে? তিনি উত্তর করলেন, কেন এতেই তো লাভ বেশী। লাভের জন্যই তো দোকান। সাধুদের দেওয়া মানে, ভগবানকে দেওয়া। কারণ ভগবানেরই রূপ সাধু। ভগবানকে দিলে তার লাভ অনন্তকাল ভোগ হয়, অমৃতত্ব লাভ। বাপ মা, আত্মীয়গণ অত চেষ্টা করেও সংসারে মন নামাতে পারলো না। তখন সকলে বলতে লাগলো, নানক পাগল হয়েছে। চৈতন্য যেই হলো অমনি নানক প্রব্রজ্যায় বের হয়ে গেলেন। অনেক দেশ ঘুরেছিলেন — মক্কা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তারপর ঐ, কাল আমরা যা দেখে এলাম। মালা জপ করছেন, দুই দিকে দু'জন অন্তরঙ্গ বসা। এক জনের নাম মর্দানা। তিনি ছিলেন মুসলমান। আর একজন বালা। মালা জপা কেন? লোকশিক্ষার জন্য। মহাপুরুষদের কাজ বোঝা যায় না। লোকে মনে করে একরকম, কিন্তু তার অর্থ ভিন্ন।

(একটু চিন্তার পর) ঠাকুরকে দেখেছিলাম, মালা হাতে নিয়েছেন। দুই একটি ঘোরাতেই অমনি বেহুঁশ, সমাধিস্থ। তখন কার জপ কে করে! হাতের মালা পড়ে গেল। ত্যাগের চরম অবস্থা এইটি। জগৎ একেবারে গলে গেছে। ব্রহ্মে মন লীন।

শ্রীম মত্ত হইয়া গান গাহিতেছেন।

গান। আমরা অতি শিশু মতি — ইত্যাদি।

গান। তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে।
আর কেহ নাহি যে, বিপদ ভয় বারে,

এ আঁধারে যে তারে।।
এক তুমি অভয় পদ জগৎ সংসারে,
কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে।
করিয়ে দুঃখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখন মন-আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে।।
জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে।।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — 'মন-আঁখি তব জ্যোতিঃ নেহারে' — এইটি সমাধি। তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না। জগৎ ছেড়ে অনন্তে মন লীন। এইটি একমাত্র কাম্য - 'Summum Bonum' (পরম মঙ্গল)। অহরহ ঠাকুরের এ অবস্থা হতো।

উঃ, মানুষের কি শক্তি দিয়েছেন দেখুন! অত দুর্বল মানুষ। কিন্তু এই যে অনন্তের veil (আবরণ) তাও penetrate (ভেদ) করতে পারে। অত শোক দুঃখ অভাব কষ্ট — তার ভেতর থেকেও ঐ mystery penetrate (রহস্য ভেদ) করতে পারে। তাই শাস্ত্রে বলে, দেবতারাও মানুষ হয়ে আসেন এইটে বুঝবার জন্য।

কাম ক্রোধ দমন করা, শোক তাপে অবিচলিত হওয়া, তিনি কৃপা করলে হয়। তা নইলে হয় না। 'ঘরে জ্বালিয়ে জ্ঞানের দীপ ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।'

অবতারগণ আসেন এইটে দেখাতে, অভয় দিতে। মহাপুরুষগণ কিছুর বশ নন। বাইরে দেখান যেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভিতর ফাক্কা, সেখানে ব্রহ্মময়ী। যোগানন্দ পুরুষ — যোগের এভারেস্টে উঠেছেন। তখন কামিনীকাঞ্চন, দেহসুখ, সব কাকবিষ্টার মত হয়ে যায়। তাঁরাই মায়ার veil (আবরণ) penetrate (ছিন্ন, ভেদ) করেন। পুরুষ পায়রার মত তাঁরা লৌকিক ব্যাপারে ঠোঁট টেনে নেন। মাদি পায়রারা মুখে ঠোঁট দিলে নেতয়ে পড়ে। কিন্তু পুরুষ পায়রারা মুখে যেই ঠোঁট লেগেছে অমনি সরে যায়। বিষয়ানন্দ আলুনি হয়ে গেছে, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা ৩রা জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ
১৯শে পৌষ ১৩৩১ সাল। শনিবার শুক্লা নবমী ৩৬ দণ্ড।৬ পল।

ষড়বিংশ অধ্যায়

অন্তরের আবরণ ছিন্ন করতে পারে মানুষ

মর্টন স্কুল। চারতলার সিঁড়ির ঘর। শীতকাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

গত কয়েকদিন ধরিয়া তিনি শিখদের গুরুদ্বারায় যাতায়াত করিতেছিলেন। গ্রন্থ সাহেবের পাঠ শুনিয়াছেন। 'সুখমনী' সাহেবের গান শুনিয়াছেন। এখন ঐ সকল দেববাণীর অনুস্মরণ চলিতেছে — গুরু নানক, অর্জুনদেব প্রভৃতির। আবার ঠাকুরের কল্পতরু দিবসের ব্রহ্মদর্শনের অনুধ্যান করিতেছেন। এখন ক্রাইস্টের কথার উদ্দীপন হইয়াছে। আবিষ্ট হইয়া তাঁহারই কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ইহুদীদের হীন দশা অসংযম ও ছলনায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলছেন, 'Ye vile and adulterous generation, ye look for a sign.' (হাস্য)। হে নীচ ব্যভিচারী জনগণ, আমি যে ঈশ-পুত্র তার প্রমাণ চাইছ। তাই কি বলছ — তোমার কেরামত দেখাও, কেরামত!

(জনৈক ভক্তের প্রতি) — কি বল? (সকলের প্রতি) কেরামত দেখতে চায় ভোগী মানুষ। তা তিনি কেন দেখাবেন? যারা শোক দুঃখে অত কাতর তাদের কেন কেরামত দেখাবেন? (ক্রাইস্ট) বললেন, যা আসল কেরামত তাই দেখাচ্ছি। কি সে কেরামত? না, 'উজান পথে করে আনাগোনা' — সর্বদা ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ।

শ্রীম গাহিতে লাগিলেন ঃ

গান। মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না।।
মনের মানুষ হয় যে জনা
ও তার নয়নে যে যায় গো চেনা
সে দুই একজনা।

সে ভাবে হাসে রসে ভাসে
উজান পথে করে আনাগোনা।।

ভক্তরা উজান পথে আনাগোনা করেন। স্রোতের অনুকূলে যায় সকলে। ভক্তগণ মহাপুরুষগণ যান প্রতিকূলে। সকলে যেদিকে চলে অর্থাৎ সংসারে, ভোগে, তাঁরা সেদিকে যান না। তাঁরা যান উজান পথে। পুরুষ পায়রার ঠোঁট ধরলে কি করে? (হাত দিয়ে টেনে নেওয়ার ভাব দেখাইয়া) এমনি করে ছিনিয়ে নেয়। আর অন্য পায়রাকে ধরলে কি করে? না, ভোগের দিকে মন gravitate (আকর্ষণ) করে।

'I will none of it'— ভোগ চাই না। খাপ খোলা তরোয়াল। No compromise (আপোষ নাই)।

'মানুষ সোহি হ্যায় যো রাম রস্ চাখে।' আর অন্যরা অন্য নিয়ে আছে — ভোগের জিনিস।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনি ঈশ্বরে ভবতাং ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

দেখুন, চৈতন্যদেবের কি কথা। কিছুই চাইছেন না — ধন, জন এই সব কিছুই না। শুধু অহৈতুকী ভক্তি। মানে অকারণ ঈশ্বরে ভালবাসা।

আহা, নানকদেব বেশ বলেছেন, আমার মন যেন ভক্তদের পাদপদ্মে থাকে। কি কথা! তাঁর উপদেশে আছে 'জপজী'তে, 'সন্তোঁ কী মহিমা বেদ ন পায়ে'। কি অনুভূতি!

ভক্ত কত বড় বস্তু তাঁরাই চিনতেন। ঠাকুরও বলেছেন, ভক্ত ও ভগবান এক, বলেছেন, ভক্ত যেন হাতি — মরলেও লাখ টাকা দাম। অর্থাৎ তার সব অমূল্য।

(একজনের প্রতি) এই যেমন আপনারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। এরই নাম ভক্ত।

ঋষিরা সেই ভক্তের জন্য হোম করছেন। আহুতি দিয়ে বলছেন, ভক্তগণ আসুন। হে ভগবান, তাঁদের পাঠিয়ে দাও।

'আমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। বিমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। প্রমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। দমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। সমায়ন্তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।'

ব্রহ্মচারিগণের জন্য আহুতি। তা নইলে প্রাণ শীতল হবে কি করে?

যারা দিবানিশি ভগবানের জন্য পাগল সেই ঋষিগণ এই প্রার্থনা করছেন। তাইতো নানকদেবও বলছেন, ভক্তদের পাদপদ্মে যেন মন থাকে। অন্য গুরুগণেরও এই ভাব।

শ্রীম (ছোট রমেশের প্রতি) — তোমরা তো যাও নাই। কাল যেও দু'জায়গায়ই। বেশ উদ্দীপন হবে। হ্যারিসন রোডের উপরই; লেখা আছে 'শ্রীগুরুগোবিন্দ সিং-এর জন্মমহোৎসব।'

শ্রীম (সকলের প্রতি) — নানক মহারাজের কি উদার ভাব! পুরীর একটি ঘটনায় তা বেশ বোঝা যায়। তিনি ঁজগন্নাথ-দর্শন করতে গেছেন। পাণ্ডারা মনে করলো মুসলমান। তাই মন্দিরে ঢুকতে দিল না। তখন আরতির সময়। ইনি আর কি করেন, বাইরে বসে গাইতে লাগলেন বিরাটের গান। তখনই রচনা করে তখনই গাইলেন, এই গানটি।

গান

গগনময় থালে রবিচন্দ্রদীপক বনে, তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চৌঁরি করে, সকল বন রাঈ ফুটন্ত জ্যোতি রে।।
কৈসে আরতি হোয়ে, ভব-খণ্ডন তেরী আরতী
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী রে।
হরিচরণ-কমল-মকরন্দ, লোভিত মন, অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা;
কৃপাজল দেও নানকসারঙ্গ কো, হো জায় তেরে নাম বাসা।।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) — শোনা যায়, যেই তিনি এই গানটি গাইতে লাগলেন, সব লোক মন্দির ছেড়ে গিয়ে তাঁর গান শুনতে লাগলো — মন্দির লোকশূন্য। দেখুন, ভক্তের মান বাড়াবার জন্য কত প্ল্যান ভগবানের! মন্দিরে ঢুকতে দিলে আর এই অমর গীতিটির রচনা হতো না। এটি একটি classical song (উত্তম পৌরাণিক গীতি) হয়ে রয়েছে। সব গুরুদ্বারায় এই গান হয়। Original (প্রথম, মূল) গানটি গুরুমুখীতে। রবিবাবু বুঝি বাংলায় adapt (রূপান্তরিত) করেছেন। কি উচ্চভাব, যেন চোখে দেখছেন সমগ্র বিশ্ব শ্রীভগবানের আরতি করছে।

যুবক — এমারসনেও এই ভাব দেখা যায়।

শ্রীম — হ্যাঁ। সে অন্যরকম। অত উঁচু ভাব নয়। ইনি দেখেছিলেন, nature (বিশ্ব প্রকৃতি) যেন যুক্ত করে ভগবানের প্রার্থনায় মগ্ন। একটি

কল্পনা, আর একটি প্রত্যক্ষ দর্শন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — নানকদেবের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মর্দানা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সর্বদা সঙ্গে থাকতেন। তিনি ছিলেন মুসলমান। নানক সর্বদা উপদেশ দিতেন, সব ঈশ্বরেচ্ছায় হয়। আর, সব পূর্ব থেকেই ঠিক হয়ে আছে। মর্দানার অত বিশ্বাস ছিল না এ কথায়। নানক মক্কায় রওনা হবার সময়ের ঘটনা। একদিন একটি মকাইয়ের দানা দেখিয়ে মর্দানা বললেন, 'গুরুজী, এ দানাটি কে খাবে?' তিনি উত্তর করলেন, 'একটা মুরগীতে খাবে, কাবুলে।' মর্দানা হাতে নিয়ে ঐ দানাটি ঝট্ করে নিজের মুখের ভিতর ফেলে দিলেন। গিলতে গিয়ে দানাটা পেটে না গিয়ে নাকের নালীতে ঢুকে পড়লো। অনেক চেষ্টায়ও ওটা বের হলো না। তারপরই দু'জনে মক্কার পথে কাবুলে গিয়ে উপস্থিত। একটা 'সরাই'-এ উঠেছেন। সরাইয়ের অঙ্গনে একটা মুরগী চরে বেড়াচ্ছিল। মর্দানার তখন খুব হাঁচি এলো। তার সঙ্গে মকাইয়ের দানাটি বের হয়ে এলো। তীরবেগে মুরগীটা গিয়ে ওটা খেয়ে ফেললো। গুরু নানক তখন হেসে বললেন, 'বিশ্বাস করতে হয়। সব ঈশ্বর ঠিক করে রেখেছেন আগে থেকেই।' অত দেখে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছে না। খাওয়াপরা সব ঠিক হয়ে আছে। এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করে তাঁর একটি অমর বাণী তৈরী হয়েছে।

বাণী। নাথ, খসমকে হাথ ক্রীৎ ক্রীৎ ধক্কা দে।
জহাঁ দানা তহাঁ খানা নানকা সচ্ হৈ ।।

নাথ, মানে নাক; খসম্ মানে মালিক, অর্থাৎ জীবের নাকে রশি বাঁধা আছে। সেই রশি ভগবানের হাতে লগ্ন। যেমন উটের নাকে বেঁধে মালিক হাতে রাখে রজ্জু। 'ক্রীৎ ক্রীৎ ধক্কা দে' মানে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে এই সত্যটিকেও বোঝান। খাওয়া-পরার জন্য মন যোগভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাই বলেন, যার দানাপানি যেখানে, তাকে তা নিতেই হবে। এইটে একটা মহাসত্য। 'নানকা' মানে মানুষ নানককে বা জীবকে, ভক্ত নানক, গুরু নানক বলছেন।

পিটারকেও ক্রাইস্ট এই কথাই বলেছিলেন। পিটারকে রোজ বলেন, 'Follow me, and I will make you fishers of men'.

'আমার সঙ্গে চলে এস। আমি তোমাদের দিয়ে মানুষ মাছ ধরাব।' পিটার তখন জেলে — মাছ মারছেন। রোজ রোজ শুনে একদিন বললেন, প্রভো আপনি তো চলে আসতে বলছেন। এখন দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার, অর্থাৎ আহার বস্ত্রাদি কোথা থেকে আসবে? খাঁটি কথা বলে ফেলছেন। জগতের দিক দিয়ে এটা বড় সত্য। ক্রাইস্ট তখন বললেন, O, ye of little faith' — এর মানে অবিশ্বাসী, বিশ্বাস কর, তিনি তোমার সব অভাবের কথা জানেন, সব পূরণ করবেন।

আর এবারে কি হলো নরেন্দ্রের? অভাবে পড়ে দিশেহারা। জগন্মাতাকে বলবার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ করলেন। ঠাকুর বললেন, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা মা পূর্বে থেকেই করে রেখেছেন। তার জন্যে ভেবো না।

এঁরা সব type of man (আদর্শ মানুষ)। তাই সকলের মনের মূল কথাটি এঁদের ভিতর দিয়ে বের হয়। যার ভগবানে বিশ্বাস হয়েছে সে নিশ্চিন্ত। অন্যরা তো অন্নবস্ত্রের ভাবনা করবেই। কতজন আর বিশ্বাসী মিলে? সবই অন্য রকম। তাই তাদের কথাটাই ব্যক্ত হয়েছে এঁদের ভিতর দিয়ে।

২

উপাধ্যায় প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম (রহস্য করিয়া, উপাধ্যায়ের প্রতি) — আসুন, আসুন, এদিকে (শ্রীম-র ডান হাতে) বসুন।

উপাধ্যায় — আপনার সঙ্গে এক আসনে বসা!

শ্রীম (উপাধ্যায়ের গায়ের আলোয়ান টানিয়া) — না, না বসুন, আপনি বসবার যোগ্য। কোথায় আছেন, এখানেই আছেন — মেছুয়াবাজারে?

উপাধ্যায় — আজ্ঞে না, বৈঠকখানায়। আপনার কৃপায় এমনি ভাল হয়ে গেছি। আপনার কথায় স্নান করে করেই ভাল হয়ে গেছি। ওষুধ খেতে হয় নাই।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু lunatic asylum (পাগলাগারদ) দেখতে গিছলাম। একজন লোক বেশ কথা

কইছে — সোসিওলজি, সাইন্স, ফিলজফি — এই সব বিষয়। তারপর বললেন, 'মশায়, আমার তিনচারজন ছেলেপুলে রয়েছে ঘরে। অপর লোকের কথায় আমাকে ধরে এনে এখানে আটকে রেখে দিয়েছে।' আমার সঙ্গীরা এই কথা শুনতে শুনতে অপর একটা পাগলের নৃত্য দেখছেন। সে খুব নাচছে। ঐ পাগলটি বললো, 'আপনারা কি দেখছেন, নাচ?' এই বলেই নাচতে লাগলো। উঃ সে কি ভীষণ নৃত্য!

বড় জিতেন — কাপড় ছেড়ে (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — হাঁ। মানুষ ভাবে, খালি বুঝি ওরাই নাচছে, নিজেরাও পাগল — নির্লজ্জের নাচ নাচছে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে, ঠাকুর বলতেন।

"এতো সব আয়োজন রয়েছে। এখন বলছে, 'আমি আমি'।"

খালি কি externalগুলি (বাইরের আয়োজন), internal-ও (ভিতরের আয়োজন)। দেখ না কত কাণ্ড! দাঁত, গলার নালী, লাংস্ (lungs) — কত কি? এইগুলি বাইরের, ভিতরে বাসনার স্তূপ। সারি সারি বাসনা রয়েছে। ইন্দ্রিয়গুলির কাজ, মনের কাজ, বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের কাজ, তারপর অহংকার। একস্×ওয়াই×জেড্ (x×y×z) — বাইরের এই একটা series (সারি)। আবার ভেতরে এ×বি×সি (a×b×c) এই আর একটা series (সারি)। এই দু'য়ের combination-এ (সংযোগে) এই strange consciousness-এর (এই অদ্ভুত চৈতন্য 'আমি'র) সৃষ্টি হয়েছে। এই দুটো series-এর (সারির) aggregate effect (সম্মিলিত ফল) হলো এই strange consciousness (অদ্ভুত চৈতন্য 'আমি')।

আবার তাই কি। এইগুলির property (গুণ) খুঁজতে খুঁজতে যাও, দেখবে infinite series (অসংখ্য সারি) রয়েছে।

ঋষিরা এইসব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই অবাক হয়ে বলেছেন, ঈশ্বর 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' (কঠো ১:২:২০)। তিনি ছোটর ছোট, আবার বড়র বড়। তাই বলে, আমাদের ভেতর infinite (অনন্ত) রয়েছেন। Finite-এর (সসীমের) ভেতর Infinite (অসীম, অনন্ত)। আবার Infinite-এর (অনন্তের) ভেতর Finite (সান্ত, সসীম)।

এতো কাণ্ড করে আমাদের এই consciousness (চৈতন্য 'আমি')। এই দুটো series-এর (সারির) মিল না হলেই তখন বলে

death (মৃত্যু)।

দেখ না, কি সুন্দর করেছেন। External (বাইরে) থেকে আসবে রূপ-রসাদির আকর্ষণ, তাই এদিকে receive (গ্রহণ) করবার জন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, স্পর্শ — এই সব রয়েছে।

শিশুর প্রথমে কোন জ্ঞান নাই। কোনটা কি, কিছুই জানে না। একটা শব্দ শুনে wrong direction-এ (বিপরীত দিকে) কান নিচ্ছে। আগুনের জ্ঞান নাই, লাল দেখে ধরতে যায়। সুন্দর জিনিস দেখলেই আকৃষ্ট হয়। আগুনে যেই হাত দিয়েছে অমনি তাত লাগায় টেনে নিলে। গোলাপের ডালে যেই হাত দিলে অমনি কাঁটার ঘা খেয়ে 'উঃ' করে সরিয়ে নিলে। এই রকম করে super-imposition (মনের ওপর রেখাপাত) হচ্চে। এইরূপ করে করে strange consciousness-এর (অদ্ভুত জ্ঞানের, 'আমির', অহংকারের, ব্যক্তিত্বের) সৃষ্টি হয়েছে। এরই সমষ্টি 'আমি'।

এখন তোমার এই limited consciousness (সীমাবদ্ধ জ্ঞানের) দ্বারা unlimited consciousness (অসীম চৈতন্যকে, জ্ঞানকে) কেমন করে পাবে? যখন এই consciousness (সসীম জ্ঞান, জীবত্ব) ঐ consciousness-এর (অসীমের) সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে তখন। তাই ঠাকুর বলেছেন, প্যাঁজ খুলে খুলে শেষে দেখে ফাক্কা। অথবা, নুনের পুতুল সমুদ্রে মিশে গেল।

এইগুলি সব super-imposition (বাহ্যজ্ঞান)। তুমি সর্বদা রয়েছ in terms of the Finite (সসীমের সহিত সংযুক্ত)। কেমন করে বুঝবে Infinite-কে (অসীমকে)?

ঠাকুর এই limited consciousness-টাকে, জীবচৈতন্যকে, unlimited consciousness, ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে যোগ করে দিতে বলতেন। বলতেন, একটা সম্পর্ক পাতিয়ে থাক — দাস, পুত্র, সখা ইত্যাদি দিয়ে। অথবা জ্ঞানযোগে 'সোঽহম্' দিয়ে সম্বন্ধ করে। সে-ই আমি। ছোট আমিটা, বড় আমির সঙ্গে যোগ করা। 'কাঁচা আমি'-টাকে 'পাকা আমি'-র সঙ্গে graft (জোড় কলম) করে দেওয়া — যেমন গাছের কলম করে, তেমনি। এই একটি মাত্র উপায় এই strange

consciousness-টাকে সকল দুঃখের কারণ এই অহংকারকে বশ করবার।

ঈশ্বর কত বড় তা মানুষের বুদ্ধিতে কতটা বুঝতে পারে? আর তাই তাঁর মহিমা মানুষ কতটাই বা বলতে পারে? গানে আছে, শিব পঞ্চমুখে বলেও সেই মহিমার শেষ করতে পারে না। (ভক্তদের প্রতি) 'শিব পঞ্চমুখে গায়, শিব পঞ্চমুখে গায়'। তারপর কি?

শ্রীম — দেখুন, শিব পঞ্চমুখে তাঁর গুণগান করেও শেষ করতে পারেন না। আবার আছে, শেষ নাগ, সহস্র মুখে তাঁর কথা শেষ করতে পারে না।

(গানের সুরে) 'সুন্দর যোগীজন চিত্তবিমোহন'। আবার এমনি আকর্ষণ ও মোহিনীশক্তি! তাঁর রূপ দেখলে আর 'অন্যরূপ লাগে না ভাল'।

শ্রীম (উপাধ্যায়ের প্রতি) — ঋষিরা বলেছেন 'দুর্গম', তাই 'যোগিভিরগম্যং'। যদি তাই হয়, তবে তুমি শোখদুঃখে কাতর জীব কি করে জানবে তাঁকে তোমার এই limited cnsciousness (ক্ষুদ্র জ্ঞান) দিয়ে?

বিবেকানন্দ সোসাইটির ভক্ত — এই একটু আগে বললেন, মানুষ অন্তরের veil penetrate (মায়াবরণ ছিন্ন) করতে পারে। আবার বললেন, 'যোগিভিরগম্যং'।

শ্রীম (সুদৃঢ় স্বরে) — হাঁ দুই-ই সত্য। 'ভক্তজন জন্যে, মাগো তুমি যে সাকার। পঞ্চে পঞ্চ লয় হয়ে তুমি নিরাকার।' তিনি দুই-ই। 'যোগিভিরগম্যং' অর্থাৎ এই হিসেবী বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায় না। কেউ যদি জানতে চায়, তপস্যা করুক — তখন তাঁর কৃপায় তাঁকে জানতে পারবে। তপস্যা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে, তিনি কৃপা করে দর্শন দেন।

তিনি সাকার, আবার নিরাকার। ছাদে উঠলে বোঝা যায় তিনি দুই-ই। ঠাকুর কখনো বলতেন, কোন কিছুই নেই। আবার কখনো বলতেন একটু একটু experience (দর্শন) হচ্ছে।

চৈতন্যদেবের কথায় বলেছিলেন, পুরীতে যখন ছিলেন তখন সব নিরাকার-ভাব হয়ে গিছলো। তাঁকে নিরাকার রূপে দেখতেন তখন। অন্য সময় সাকার দেখতেন — রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ।

বড় জিতেন — ঠাকুর কখনো বলতেন, ছবি-টবি ভাল লাগছে না। সেটা কি অবস্থা?

শ্রীম — হাঁ। আরও বলতেন ধূপটুপ ভাল লাগছে না — ফুলটুল। এই sense knowledge (বিষয়বুদ্ধি) দিয়ে এ সব বোঝা যায় না। ঠাকুর চিন্ময় দেখতেন সব। নিরাকারই হোক আর সাকারই হোক, সব সচ্চিদানন্দ তাঁর কাছে! তাঁর মনটি ছিল 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'।

আহা, সেই পরমহংস অবস্থা আর দেখবো না! যোগানন্দ-সাগরে অবগাহনের পর একেবারে নূতন। কারো সঙ্গে মিলে না। আবার সকলের সঙ্গে মিলে।

তখন সমাধিতে experiences (জগতের জ্ঞান) সব শেষ। সম্পূর্ণ নূতন অবস্থা ঠাকুরের। তখন কোন super-imposition (ভ্রান্তিজ্ঞান) নেই। এ যেন 'বন থেকে বেরুল টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে!'

ব্রহ্মবস্তু ভিতরে ঢুকে — ব্রহ্ম মানে বৃহৎ কি না — একেবারে সব তোলপাড় করে দিচ্ছে। যেমন কুঁড়েঘরে হাতি ঢুকলে সব তোলপাড় হয়ে যায়।

শ্রীম (যুবকের প্রতি) – A tree is known by its fruits. ফল দেখলে গাছ চেনা যায়। তেমনি ঠাকুর কি ছিলেন এটা বোঝা যায় ফল দেখে। কি সে ফল? দেখ না, ক'দিনের ভিতর তাঁকে নিয়ে কত কাণ্ড হচ্ছে world (জগৎ) জুড়ে। এদিকে নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণ। আর তাঁর কথা জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা মাথায় তুলে নিচ্ছে! ম্যাকস্‌মূলার তাইতো জীবনী লিখলেন। এতেই বোঝা যায় তিনি কে! অর্থাৎ অবতার।

বিবেকানন্দ সোসাইটির একজন ব্রহ্মচারী আসিলেন। অমনি কথার স্রোত উল্টাইয়া গেল।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আজকাল মঠে অনেক মহৎ লোক আসছে। বি-এ এম-এ পাশ সব। আমরা দেখে এলাম কিনা (বিদ্যাপীঠে, মিহিজামে)। হিমালয়ে কতকগুলি আবার তপস্যা করছে। এদের সঙ্গে এই সব বাইরের বি-এ এম-এ-র তুলনা? ও যদি হিমালয় পর্বত হয়, এ সর্ষপ। আর, ও যদি মহাসাগর হয়, এ যেন গোষ্পদে জল। এত তফাৎ।

কারো বার বছর, কারো ষোল বছর ব্রহ্মচর্য। অন্য সব লোকদের

ভেতর টাকা কড়ি, মান সম্ভ্রমের বাসনা গজগজ করছে। দিনরাত কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা চলছে। আর, মঠের ওদের কি? কিসে ঈশ্বরদর্শন হয় তার জন্য ব্যাকুল। ব্রহ্মজ্ঞানী মায়ের মত দরকার হলে কালীঘাটে গিয়ে হত্যা দিচ্ছে। যাতে তাঁকে লাভ হয় তার জন্য সব করতে প্রস্তুত। এমন যে অমূল্য জীবন তাও উৎসর্গ করছে।

পুলি সব দেখতে এক রকম। কিন্তু কারো ভিতর ক্ষীরের পোর, কারো ভিতর কলাই ডাল। তেমনি মানুষ। দেখতে এক রকম হলেই কি সব সমান?

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একদিন রাত ন'টা। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ ঠাকুর বলছেন, ভক্তরা কেউ মনে না করে আমি না হলে হবে না। অর্থাৎ লোকশিক্ষা। এই বলেই আবার বলছেন, যেমন একটা জলের কল। তার একটা পাইপ নষ্ট হলে ইঞ্জিনিয়ার এসে বদলিয়ে আর একটা লাগিয়ে দেয়। তেমনি Divine Engineer (ঈশ্বর) এসে ফস্ করে আর একটা নূতন পাইপ বসিয়ে দিয়ে যাবে। তাঁর কাজ কিছুতেই আটকাবে না।

ভক্তরা যেন এক একটি প্রণালী। নানা প্রণালী দিয়ে একই জল বের হচ্ছে। সবই তাঁর ভাবের প্রচার করছে এক একটা দিক। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর।

বড় জিতেন — অবতার না এলে যে সব অন্য রকম হয়ে যায়!

শ্রীম — যেমন wave-এর (তরঙ্গের) hollow and crest (পতন ও উত্থান)। Hollow (পতন) হয় কেন? না, আবার উঠবে বলে। সে তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। ধর্মের পতন ও উত্থান।

ভক্তরা কি মনে করছেন, অবতারের সাঙ্গপাঙ্গ না থাকলে তাঁর কাজ লোপ পেয়ে যাবে, কাজ চলবে না?

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন। তারপর গুনগুন করিয়া 'শম্ভু, শম্ভু' বলিতেছেন।

পুনরায় কথা।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আমার এখন কাশীর কথা মনে পড়ছে। সেই সিন্‌টি দেখছি। জলটল মাথায় নিয়ে আসছে সব। আর সব লোক

সারি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখছে কাঁধে কলসী। স্বয়ম্ভূ যিনি, আমি তাঁর দাস। এই মানে, এই বলার। তার মধ্যে একজন সাধু নৃত্য করছে। ঐ 'শম্ভু' অনাহত শব্দে মিলে যাচ্ছে।

তাঁর নামে আনন্দ হলে কাম ক্রোধ দূরে চলে যায়।

শ্রীম একা একা কিছুক্ষণ ধরিয়া 'শম্ভু শম্ভু' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তরাও কেহ কেহ ঐ নামকীর্তনে যোগদান করিলেন। আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার আর একটি গান গাহিতেছেন।

গান। কবে আমার সুদিন হবে
যেদিন কুদিন গিয়ে সুদিন হবে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, এই গানটি শুনে ঠাকুর নৃত্য করতেন। সমাধি হয়ে যেতো। অর্থাৎ, আমরা যে 'আমি'-টার কথা বললাম — সেটা জবাব দিয়ে দিল। রণে ভঙ্গ দিল। Surrender (আত্মসমর্পণ) করলো। Higher (সত্যিকার) 'আমি'তে লীন হয়ে গেল। অর্থাৎ super-impositions (উপাধিগুলো) খুলে গেল। এখন লাটাই শূন্য। সেই অবস্থা যোগীরা আস্বাদ করতে পারেন যোগে।

এখন রাত্রি নয়টা।

মর্টন স্কুল, কলিকাতা। জানুয়ারী ৩, ১৯২৫ খ্রীঃ।
পৌষ ১৯, ১৩৩১ সাল। শনিবার, শুক্লা নবমী ৩৯ দণ্ড। ৬ পল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়
অবতার সূর্য, সাঙ্গোপাঙ্গ রশ্মি

'ঠাকুরবাড়ি'। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা। সকাল সাড়ে নয়টা। শ্রীম দ্বিতলের নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন, খাটের উপর দক্ষিণাস্য। হাতে কথামৃতের পঞ্চম ভাগের ছাপা ফর্মা।

অন্তেবাসী আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে সুকুমার মহারাজ এসেছেন মঠ হতে আপনাকে দর্শন করতে। নামে চিনিতে পারিলেন না। তাই অন্তেবাসী আবার বলিলেন, 'ওঁর' আরো দু'টি নাম আছে — শম্ভু মহারাজ ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ। বিদ্যাপীঠের হেড মাস্টার ছিলেন। এখন তপস্যায় যাচ্ছেন — উত্তরাখণ্ডে।

শ্রীম — কই তিনি — আসুন না। (গৃহে প্রবেশ করিলে) ও, এঁকে যে আমি চিনি (হাস্য)।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ — জিতেন বিশ্বাসদের (স্বামী বিশ্বানন্দ) সঙ্গে আগে এখানে আসতাম।

আজ সকাল বেলায় তিনজন সাধু — স্বামী অবিনাশানন্দ, স্বামী সৎস্বরূপানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ — বেলুড় মঠ হইতে বাসে হাওড়া স্টেশনে আসেন। সেখান হইতে স্বামী অবিনাশানন্দ যান ওয়েলিংটন লেনের অদ্বৈতাশ্রমে। আর ইঁহারা দুইজন আসিলেন শ্রীম-দর্শনে।

শ্রীম আহ্লাদে আহ্বান করিয়া স্বামী সৎস্বরূপানন্দকে নিজের খাটের উপর দক্ষিণ দিকে বসাইলেন। আর একজন বসিলেন শ্রীম-র সম্মুখে চেয়ারে।

শ্রীম-র কক্ষটি খুব ক্ষুদ্র, ৮ × ৬ ফুট। ঐ ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকে দেয়াল ঘেষিয়া একটি তক্তাপোষ। তাহার উত্তরে একটি টেবিল। তাহাতে আছে পুস্তক, 'কথামৃতে'র ডায়েরী, পঞ্চম ভাগের ছাপান ফর্মা, এই গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি ছোট আলমারী। উহা এনসাইক্লোপেডিয়া প্রভৃতি

গ্রন্থে পরিপূর্ণ। খাটের পূর্বদিকে মধ্যস্থলে একটি দরজা পূর্বমুখী। উহা দ্বারা পাশের পূর্বের ঘরে যাতায়াত হয়। দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি জানালা। তাহার পশ্চিমে দরজা। এই দরজা দিয়া শ্রীম বারান্দায় যাতায়াত করেন। উত্তরের দেয়ালের জানালাটিতে সরু জাল দিয়া ঢাকা। পশ্চিম দিকে নিরেট দেয়াল। এই দেয়ালে ও অপর দেয়ালে নানা দেবদেবী ও নরদেবগণের ছবি টাঙ্গান। ঠাকুর, স্বামীজী, মা, চৈতন্য-সংকীর্তন, গৌর নিতাই, ডিমে তা-দেওয়া পাখী, প্রভৃতির ছবিও রহিয়াছে। তক্তাপোষের উপর দুইখানা তোষক, চাদর ও বালিশ। বিছানা কিঞ্চিৎ ময়লা।

শ্রীম তক্তাপোষে উপবিষ্ট। গায়ে ফতুয়া। তাহার উপর সাদা ধবধবে লাল পেড়ে আধখানা ধুতি চাদরের মত করিয়া তাঁহার গায়ে জড়ান।

শ্রীম-র চক্ষু স্থির ও উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল আনন্দময়, উন্নত ললাট, আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু। শীর্ষদেশ বিরল-কেশ। তিনি প্রসন্নভাবে উদ্দীপনাময়ী কথা কহিতেছেন।

শ্রীম (স্বামী সৎস্বরূপানন্দের প্রতি) – God speed! The sooner the better. It's a sight for the Gods to see. Simply, struggle is enough, not to speak of realisation — শুভম্ শীঘ্রম্। যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। দেবগণেরও বাঞ্ছনীয় এ দৃশ্য। কেবল মাত্র তপস্যাই যথেষ্ট। আত্মদর্শনের আর কথা কি!

একটি সাধু (স্বগত) — এত শারীরিক যন্ত্রণাতেও কি প্রশান্তোজ্জ্বল চক্ষু দু'টি, কি প্রেমানন্দময় মুখমণ্ডল! মন যেন আনন্দ-সাগরে ডুবে আছে। ভগবানে কত ভালবাসায় এরূপ হয়!

স্বামী রাঘবানন্দ প্রবেশ করিলেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে চেয়ার ছাড়িয়া দিলেন। তিনি শ্রীম-র আদেশে বিছানার উত্তর দিকে গিয়া বসিলেন।

শ্রীম (স্বামী সৎস্বরূপানন্দের প্রতি চাহিয়া) — আপনারা আড্ডা করেছেন কোথায়?

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ — মুসুরী পাহাড়ের নিচে, রাজপুরের অম্বিকা মন্দিরে। দেরাদুন থেকে আট মাইল উপরে। কিষণপুর আশ্রম তিন মাইল নিচে।

শ্রীম — আর কেউ আছেন ওখানে?

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ — আজ্ঞে হ্যাঁ। পাটনার স্বামী অব্যক্তানন্দ, আর কাশীর স্বামী জ্ঞানানন্দ ও স্বামী জগদানন্দ মহারাজ।

শ্রীম — কে জ্ঞানানন্দ?

অন্তেবাসী (সহাস্যে) — যিনি কুমীরকে ভয় করেন না। বলেছিলেন, কুমীরকে কেটে ঝোল করে খাব।

শ্রীম (উচ্চহাস্যে) — হাঁ, হাঁ, চিনেছি। খুব সাহসী! (সকলের হাস্যতরঙ্গ)।

স্বামী রাঘবানন্দ — রাজপুর বেশ জায়গা — বেশ association (পবিত্র সম্বন্ধ) আছে। হরি মহারাজের সঙ্গে স্বামীজীর মিলন হয় ওখানে। ওখানেই স্বামীজীর অনুরোধে আমেরিকা যেতে রাজী হন তিনি।

শ্রীম (তিনতলার ঠাকুরঘরের ঘন্টাধ্বনি শুনিয়া অন্তেবাসীর প্রতি) — যান না আপনি, এঁকে আমাদের ঠাকুরঘর দেখিয়ে আনুন।

সাধুরা সকলে উপরে ঠাকুরঘরে গেলেন। ঠাকুরের পাদুকা দর্শন করিলেন। তারপর বাল্যভোগের প্রসাদী ফল মিষ্টি 'নাটমন্দিরে' বসিয়া সেবা করিলেন। আবার সকলে নিচে শ্রীম-র নিকটে ফিরিয়া আসিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ — প্রুফ এসেছে। (শ্রীম-র অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া পুনরায়) — প্রুফ এসেছে।

শ্রীম — হাঁ। (স্বামী সৎস্বরূপানন্দের প্রতি) — এই আমাদের ফিফথ্ পার্ট হচ্ছে। 'পরিশিষ্টে'র স্বামীজীর কথা এখন ছাপা চলছে। এ সব ঘটনা হাফ-এ-সেঞ্চুরী (অর্ধ শতাব্দী) হয়েছে। এখনো মনে হচ্ছে, কাল হয়েছে।

শ্রীম — (স্মিত হাস্যানন্দে, অন্তেবাসীর প্রতি) — বল দিকিন্ কেন চিরনূতন?

সকলে ভাবিতেছেন।

শ্রীম — ঠাকুর true ideal (শাশ্বত আদর্শ) দিয়েছেন কিনা। সব লোক ঐ দিকে যাচ্ছে। যে যে stage-এ (স্তরে) আছে সে সেই স্থান থেকে light (আলো) পাচ্ছে। তাই চিরনূতন। Different stage-এ (বিভিন্ন স্তরে) আছে কিনা লোক। সকলে কিছু এক stage-এ (স্তরে) নাই।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, ঠাকুর যে 'ঘর' বলে দিতেন, ওটা কি — যেমন 'অখণ্ডের ঘর'?

শ্রীম — ওটা lead (অগ্রগামী) করার জন্য। একটা ভাল জিনিস সামনে ধরা থাকলে ভালর দিকে এগুবে — তারই জন্য। Stage to stage lead, এক স্তর থেকে অপর স্তরে — উন্নততর অবস্থাতে পরিচালনা করবার জন্য।

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, stage (স্তর) কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট কি করে জানবে? কে বলে দেবেন? পাঁচ জনে করছে একটা, আমি করছি আর একটা। এখন কোনটা বড়, কোনটা ছোট কে বলবে?

শ্রীম — যিনি মীমাংসা করবেন তিনি সবই দেখছেন, হয়তো হাসছেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, আর একটা পথ আছে — 'সোঽহং'। সে দিক দিয়ে নয়। এ ব্যাপারটি আলাদা — (সহাস্যে) এ সে দিক দিয়ে নয়।

অন্তেবাসী — কি, অবতার?

শ্রীম — হ্যাঁ, অবতার।

শ্রীম (স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) — বিভিন্ন স্তর তিনিই করেছেন। কিন্তু এগুলি মারামারি করে মরছে। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া তো গাছের পাতাটিও নড়ে না।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।। (গীতা ৪/৫)

অতীত যে কালে জানেন ভবিষ্যৎ-ও জানেন। কিন্তু 'তুমি' জান না। তুমি আমাকে ধর। তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। 'মা শুচ'। দুঃখ করো না। আমাকে ধর। কোনও ভয় নাই।

এই যে স্পষ্ট message (প্রতিজ্ঞা), এ শুনছে কে?

শ্রীম-র দৃষ্টি ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ। নয়নদ্বয় জ্বলজ্বল করিতেছে।

শ্রীম (স্বগত) — 'অর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।'

(ঈশোপনিষদ ৮)

শ্রীম (সকলের প্রতি) — তাঁকে চিনবে কে? তিনিই সব দিচ্ছেন। তিনিই সব করছেন। তিনিই সব হয়েছেন।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — স্বামীজী আমেরিকা থেকে ঘুরে এসে বলরামবাবুর বাড়ির ছাদে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিলেন, 'তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয় — তাঁর (ঠাকুরের) এ কথাটা আমি এখনো বুঝতে পারলাম না।'

কিন্তু পরে তাঁর কৃপায় বুঝেছিলেন — later perception! তাই তো এইসব 'আরতি' 'স্তব' হলো — 'খণ্ডন ভব-বন্ধন', 'ওঁ হ্রীং ঋতং'।

হলোই বা পরে। বড় ফুল দেরীতে ফোটে। যেমন পদ্মফুল। ছোট ফুল শীঘ্র ফোটে আবার ঝরেও যায় শীঘ্র।

স্বামীজীর হাত দিয়ে ঠাকুর এই সব স্তবস্তুতি, বন্দনা বের করেছেন। তবে তো world (জগৎ) শুনবে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — বলতো মুখস্থ?

অন্তেবাসী (ধীরে ধীরে) —

খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগবন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর, নির্গুণ গুণময়।। ইত্যাদি।

শ্রীম — দেখ, কি বলছেন স্বামীজী — যিনি নিরাকার নির্গুণ পরমব্রহ্ম, তিনিই ইদানীং সাকার সগুণ 'নররূপধর' শ্রীরামকৃষ্ণ। বলছেন, যে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নেবে সে অনায়াসে এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যাবে। ঈশ্বর ছাড়া এ শক্তি আর কার আছে? আবার বলছেন, 'দৃঢ়-নিশ্চয় মানসবান', অর্থাৎ সমাধিস্থ হয়েও তিনি 'নিষ্কারণ ভকতশরণ'।

সব contradictions (বিরুদ্ধভাব) meet করে (মিলিত হয়) একমাত্র ঈশ্বরে। তাই এই আরতির স্তবে বলছেন স্বামীজী — ঠাকুর সকল বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়। আবার তারও উপরে।

(অন্তেবাসীর প্রতি) — 'নমো নমো' — কি তারপর?

অন্তেবাসী — 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার।'

শ্রীম — দেখ, ঠাকুর 'নররূপধর', 'নরবর', আবার 'বাক্যমনাতীত'।

এর মানে যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই এখন অবতার হয়ে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহে। তিনিই আবার তাঁর শক্তিসহায়ে জগৎলীলা করছেন — সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।

এই দু'টি স্তব পড়ে ধ্যান করলে তবে ধ্যান ঠিক হয়। নির্জনে যারা থাকবে এই স্তব পাঠ করলে ঠাকুরকে বুঝতে পারবে।

অন্তেবাসী — মহাপুরুষ মহারাজও সুন্দরকে এই কথাই বলেছিলেন। স্বামীজী ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলবার সব কথা এই সব স্তবে বলেছেন।

শ্রীম — তা আর বলবেন না! সেই Divine Personality-র (দৈবীপুরুষের) নিজের মুখের কথাই ঐ সব, সেই 'নরবরের'ই কথা, সেই Grand Man-এর, মহামানবের কথা। 'Behold the Man!' (এই মহামানবকে চক্ষুর সম্মুখে দর্শন কর)। ক্রাইস্ট নিজের কথাই নিজে বলেছিলেন। স্বামীজী সংকলন করেছেন — সেই মহামানবের নিজের মুখের কথাগুলি এই স্তব-পুষ্পাঞ্জলিতে।

কাশীপুরে যিনি শেষ অবধি বললেন, নিজে যদি (ঠাকুর) বলেন অবতার, তবে বিশ্বাস করি। সেই লোকই পরে এই সব স্তব রচনা করলেন।

শুধু মুখস্থ করে, চিন্তা করে কই লোক? এ দু'টি চিন্তা করলেই সব হবে — তাঁকে ঠিক ঠিক বোঝা যাবে।

এইগুলি রচনা করেছেন বলেই তো আজ কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে। কত মঠ, আশ্রমে এইসব স্তবগান হচ্ছে সারা জগৎ জুড়ে।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — 'উগ্রং কৃণোমি' — চণ্ডীতে আছে (ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে) — উঁচুতে তুলি, আবার প্রয়োজন হলে নিচে ফেলে দি। (অন্তেবাসীর প্রতি) মুখস্থ আছে তোমার — বল না?

অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ একসঙ্গে আবৃত্তি করিতেছেন —

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।। ইত্যাদি
(ঋগ্বেদ ১০/১২৫/১)

শ্রীম — এই মন্ত্রে বলেছেন, 'যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।' আমি যাকে যাকে ইচ্ছা করি তাকে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি, কারুকে ব্রহ্মা করি, কারুকে ঋষি করি এবং কারুকেও বা অতি প্রজ্ঞাশালী করি।

এই যা বলছেন, তার দৃষ্টান্ত একবার দেখ — স্বামীজীকে জগৎগুরু

করলেন। আর দু একজনকে নিচে নামিয়ে দিলেন। একজনের পরমহংস অবস্থা, বলতেন। আবার পড়ে গেল। অনেক দিন আসে নি দেখে ঠাকুর বললেন — জান, কেন আসে না? যা বারণ করেছি তাই করবে — মেয়েদের সঙ্গে পড়েছে। আর একজনকে বলতেন, ঈশ্বরকোটি। শেষের দিকে বললেন, 'কে তো কে'। মানে ছেড়ে দিলেন। নিচে পড়ে গেল।

অন্যের কা কথা। পরমহংস অবস্থা থেকে একজন, ঈশ্বরকোটি অবস্থা থেকে আর একজন বিচ্যুত হলো। এ দেখেও কি লোকের চৈতন্য হয়!

শ্রীম — কাঁচা মন তো, যেন ধোপা-ঘরের কাপড়। যে রং-এ ছোপাবে সেই রং হবে, কিন্তু তাঁকে দর্শন করলে আর এরূপ হয় না। তখন environment (পরিবেশ) কিছু করতে পারে না। তখন 'জিতসঙ্গদোষা' — সঙ্গদোষ কিছু করতে পারে না।

একজন সাধু (স্বগত) — স্বামী শুদ্ধানন্দ ভবনাথের কথা একদিন জিজ্ঞাসা করায় শ্রীম এই উত্তরই দিয়েছিলেন — যিনি ওঠাতে পারেন, তিনি নাবাতেও পারেন। তাই বুঝি আচার্যগণ বলেন, ঈশ্বর অবতার — 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম্ সমর্থঃ!

স্বামী রাঘবানন্দ — আচ্ছা, যদি সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, তা হলে তপস্যার কোন অর্থ থাকে না।

শ্রীম — তপস্যাও তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। কত তো শুনছে লোক, কিন্তু করছে কোথায়? তিনি ইচ্ছা দিলে শতবাধা থাকলেও তপস্যা করে। তাঁর ইচ্ছা না হলে শত সুযোগ থাকলেও করবে না। মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা। যতক্ষণ আর পাঁচটা বিষয়ে পুরুষকার দেখান হচ্ছে ততক্ষণ তপস্যার চেষ্টা করা। তপস্যা করলে এই বোঝা যায়, তপস্যা দ্বারা তাঁকে লাভ হয় না। তাঁর কৃপাতেই তাঁকে লাভ হয়। তবুও আর করবে কি? ঐতে লগ্ন থাকার চেষ্টা। যখন নিন্দনীয় কার্যে মন যায় তখনো চেষ্টা করা উহা ছাড়বার। তা করলেও জোর করে নিচে নামিয়ে দেয় মনকে। তখন আর কি করবে মানুষ! তখন ভুগতেই হবে।

শেষ কথা এই, তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয় — 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। (একজন সাধুর প্রতি) কি মন্ত্রটা?

একজন সাধু —

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুণা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

শ্রীম — আবার আছে — 'ন তপসা ন চেজ্যয়া ন বহূণা শ্রুতেন।'

'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ ছাপা চলিতেছে। শ্রীম-র শরীর অসুস্থ থাকায় প্রুফ সব একা দেখিতে পারেন না। তাই স্বামী রাঘবানন্দ সাহায্য করেন। ইনি শ্রীমর সঙ্গেই আজকাল আছেন।

স্বামী রাঘবানন্দ পঞ্চম ভাগের নূতন কথা পড়িয়া সাধুদের শুনাইতে চাহেন। সাধুরা চাহেন শ্রীম-র নিজ মুখের কথা শুনিতে। বারবার বলায় স্বামী রাঘবানন্দের আগ্রহ দেখিয়া সাধুরা উহা শুনিতে চাহিলেন। ঠাকুরের দেশের শ্যামবাজারের কথা আছে। তারপর জোড়াসাঁকোর হরিসভার কথা। ঠাকুর বলিতেছেন হরিসভার অবস্থা — ভাবে এমনি হলো যে, শরীর যায় যায়।

শ্রীম — ঠাকুরের সামনে যখন গয়ার কথা পড়া হচ্ছিল তখনো আমরা দেখেছিলাম তাঁকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে। (স্মৃতি অতীতে নিবদ্ধ করিয়া) পূর্বের কথা স্মরণ হয়েছে কিনা। তিনিই তো নিজেকে নিজে জানতেন — 'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম'। (গীতা ১০/১৫)

অন্তেবাসী — চৈতন্যদেবের গয়াতে যা হয়েছিল সেই কথা?

শ্রীম — হ্যাঁ। চৈতন্যদেব যখন পিতার শ্রাদ্ধ করতে গয়া গিছলেন, সেখানে তাঁর গভীর ভাব হয়েছিল — ঈশ্বরদর্শন হয়েছিল।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ — ও-ও, সেইকথা!

শ্রীম — ঠাকুর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন, পাঠ শুনে।

অন্তেবাসী — কোথায়, দক্ষিণেশ্বরে?

শ্রীম — হাঁ, দক্ষিণেশ্বরে।

অন্তেবাসী — 'কথামৃত'এর পাঠকেরা মনে করেন, গয়া যেতেন না ঠাকুর, ওখান থেকে অবতার হয়ে জন্ম নিয়েছেন বলে। চৈতন্যাবতারের কথা স্মরণ হলে ভাবে শরীর চলে যাবে। এ কথা মনে কারো প্রায় ওঠে না।

শ্রীম — তাইতো পুরীতেও যেতেন না। চৈতন্যদেব ওখানে বিশ বছর ছিলেন। শেষের বারো বছর মহাভাবে থাকতেন। চৈতন্যলীলার ঐ

সব কথা স্মরণ হলে মহাভাবে শরীর চলে যাবে তাই যেতেন না। চৈতন্যদেবই ইদানীং শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি নিজে বলেছেন, 'ক্রাইস্ট চৈতন্য আর আমি এক।'

শ্রীম (সকলের প্রতি) — স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন প্রথম দিনে — নদের গৌরের নাম শুনেছিস্, আমি সেই। উনি উত্তর করলেন, হাঁ শুনেছি, লোক 'গৌর গৌর' করে।

আমাদের এই বাড়ি তখন পার্টিশান হয় নাই। ঐ সামনের ঘরে বসে স্বামীজী আমায় এই কথা বললেন। আর বললেন, মশায়, লোকটা কি পাগল হয়েছে নাকি? বলে কিনা, আমি নদের সেই গৌর (সকলের হাস্য)।

অন্তেবাসী — আচ্ছা, স্বামীজী এ কথাটা কিভাবে নিলেন?

শ্রীম (সহাস্যে) — কি আর ভাব! ছেলেমানুষ তখন, আবার তাতে ইংরেজী পড়া!

শ্রীম ও স্বামী রাঘবানন্দ (সমস্বরে) — Re-incarnation-এ (পুনর্জন্মে) বিশ্বাস করেন নাই।

অন্তেবাসী — আমার ভুল ধারণা দূর হলো। আমার মনে হয়েছিল চৈতন্যদেবের অবতারত্ব ঠাকুর দাবী করায় স্বামীজী পাগল বলেছিলেন।

শ্রীম — ছেলেমানুষরা যে ভাবে নেয় স্বামীজীও সেই ভাবে নিয়েছিলেন। ইংরেজী পড়ে তখন অনেকে sceptical (সংশয়বাদী) হয়ে পড়েছিল। পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন না। ইংরেজরা যে মানে না, তাই।

তাই তো ঠাকুর অত জোর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে ঐ সব লোকের কাছে কথা কইতেন। সব ইংরেজী পড়া লোক যেতো কিনা ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর বলতেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন। এই যে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন।' তবে sceptic-দের (সংশয়াপন্নদের) মনে বিশ্বাস হবে। যতটুকু সম্ভব সাধারণের কাছে ভগবানকে প্রকট করা, ঠাকুর ততটুকু দেখিয়ে গেছেন এই নাস্তিক যুগে।

শ্রীম (সহাস্যে) — নরেন্দ্র বলেছিলেন, এদিকে তো কত টান টানছেন আমায়, তখন আমি কিন্তু সিমলার বাড়িতে আরামে ঘুমুচ্ছি।

দেখ, যে ব্যক্তি পাগল বললেন, সেই তিনিই আবার স্তবে কি বলেছেন তাঁকে — তস্মাৎ ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো। অর্থাৎ হে দীনের বন্ধু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, তাই তুমিই আমার একমাত্র শরণ।

শ্রীম (সাধুদের প্রতি) — অবতার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ, অনেক তফাৎ। যেমন সূর্য আর তাঁর রশ্মি। রশ্মি সাঙ্গোপাঙ্গ।

শ্রীম-র হাতের বেদনা চলিতেছে। কষ্ট হইতেছে। অতক্ষণ কথামৃত-বর্ষণে তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সাধুরাও অমৃতপানে মগ্ন। অন্তেবাসী বুঝিতে পারিয়া পাখার হাওয়া করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন, এ দরজাটা খুলে দাও। স্বামী সৎস্বরূপানন্দ পূর্বদিকের দরজা খুলিয়া দিলেন। দুই মিনিট পর শ্রীম হাওয়া বন্ধ করিতে বলিলেন। সাধুর সেবা নিবেন না।

ঘোষ মহাশয়ের প্রবেশ। শ্রীম রসিকতার সহিত বলিতে লাগিলেন, আসুন, ঘোষমশায়, আসুন। (সহাস্যে) সন্দেশমশায়ও বলা যায়, কেন না, সন্দেশের দোকানে কাজ করেন (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (ঘোষ মহাশয়ের প্রতি) — আপনার সন্দেশ খেতে ইচ্ছা হয় না? Environment-এর influence (পরিবেশের প্রভাব) আছে কি না।

(গম্ভীরভাবে) মন যে রং-এ ছোপাবে সেই রঙ ধরবে। (কাঁচা মন) পাকা হলে সে ভয় নাই। পাকা হয় তাঁকে দর্শন করলে। (ঘোষমহাশয়ের প্রতি) হাওয়া করুন সাধুদের।

ঘোষমহাশয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। স্থূলকায়, ভালমানুষ। মুখে সদা প্রসন্ন ভাব। সর্বদা চুপ থাকেন।

শ্রীম কথামৃতের পরিশিষ্ট হাতে লইয়া পৃষ্ঠা গণনা করিতেছেন।

শ্রীম — মাত্র তের পৃষ্ঠা বাকী আছে ছাপা হতে।

স্বামী রাঘবানন্দ — এ হয়ে গেলে নূতন কিছু দিতে হবে।

শ্রীম — হাঁ। উলটিয়ে দেখলাম (ডায়েরী) অনেক materials (সামগ্রী) দেবার আছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — ফিফ্‌থ পার্ট বড় হলে ভাল হয় আর তো বের হবার সম্ভাবনা নাই। Humanity-র (মানুষের) এতে অশেষ কল্যাণ হবে।

একজন সাধু — এঁর শরীর থাকলে মানুষের অধিক কল্যাণ হবে। লিখতে গিয়ে অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর আরো খারাপ হলে সমূহ অকল্যাণ।

শ্রীম — লিখলে ঠাকুরের চিন্তা হয়ে যায়। তা না হলে শুধু বেদনার কথা মনে পড়ে। Labour of love (প্রেমের সেবা)।

স্বামী রাঘবানন্দ — দিনপঞ্জিকা দেওয়া যাবে এর পর।

শ্রীম — না, তা এখন চলবে না! নূতন লিখতে হবে।

অন্তেবাসী — দিনপঞ্জিকা কি?

স্বামী রাঘবানন্দ — Date and year (তারিখ ও সাল) অনুযায়ী একটা arrangement (সূচী রচনা)।

শ্রীম — এটা পড়লে কোথায় কি আছে সব জানা যাবে।

শ্রীম ঐ দিনপঞ্জিকার একটা কপি স্বামী সৎস্বরূপানন্দের হাতে দিলেন। অন্তেবাসীও দেখিতেছেন।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — এঁদের নিয়ে গিয়ে সকলে ও-ঘরে বসলে হয়।

সাধুরা উঠিয়া গিয়া পূর্বপার্শ্বের ঘরে মাদুর পাতিয়া বসিলেন। শ্রীম বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। বেদনা বাড়িয়াছে। ঘোষমহাশয় পাখা করিতেছেন।

সাধুরা দেখিতেছেন। কিন্তু কিছু করিবার উপায় নাই। বেদনায় অজ্ঞান না হইলে শ্রীম-র সেবা করিবার উপায় নাই।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ (অন্তেবাসীর প্রতি) — কেন বললেন না আগে উঠে আসতে? আমি বুঝতে পেরেছিলাম বেদনা বেড়েছে। আপনারা কিছু না বলায় আমিও বলি নি।

অন্তেবাসী — মা'র কাছে ছেলে। সে মা'র কষ্ট বোঝে না, খালি স্নেহ চায় আমরাও তাই।

ঘোষমহাশয় একটা হ্যারিকেন আনিয়াছেন, সেক দিতে হইবে। শ্রীম গামছা দিয়া ডান হাতের কনুই চাপিয়া ধরিলেন। কথা কহিবার সময়ও ফ্লানেলে কনুইটা বাঁধা ছিল। আজ আট মাস বেদনা চলিতেছে।

বেলা এগারটা, সাধুরা বিদায় লইলেন। বাহির হইবার সময় শ্রীম-র ঘরের পশ্চিম দেয়ালে ডিমে-তা-দেওয়া পাখীর একটি ছবি আছে —

অন্তেবাসী স্বামী সৎস্বরূপানন্দকে উহা দেখাইয়া বলিলেন, এ-টি ঠাকুরের কথায় করান হয়েছিল শরীর যাওয়ার পর।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর মণিকে বলিয়াছিলেন, 'যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে — সর্বদা আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফেলে, দেখলেই বোঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে; উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?'

সাধুরা সকলে রাস্তায় চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন — এমন মহাপুরুষেরও রোগের হাত হতে রক্ষা নাই। আর জগৎ স্বার্থপর, আমরাও স্বার্থপর। শ্রীম আমাদের দিলেন অমৃত। আর আমরা চলে এলাম বেদনার সময়! ঈশ্বর ও গুরুর ঋণ কি কেউ শোধ করতে পারে?

বেলুড় মঠ।
১০ই মে, ১৯৩২ খ্রীঃ, মঙ্গলবার,
বৈশাখ, শুক্লা পঞ্চমী, ১৩৩৯ সাল।

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায়

পরিক্রমা ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুনরায় বনভোজন দক্ষিণেশ্বর তপোবনে ১৮

তৃতীয় অধ্যায়

সর্বত্যাগী সাধুর সঙ্গ করিলে অনেকটা রক্ষা ২৯

চতুর্থ অধ্যায়

অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চাই মনের সঙ্গে ৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

ভারত আবার উঠবে আত্মজ্ঞান মহিমায় ৪৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধু শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্য ৫৯

সপ্তম অধ্যায়

জীবত্ব নাই অবতারে ৬৮

অষ্টম অধ্যায়

তখন এই মানুষই হয় দেবমানুষ ৭৭

নবম অধ্যায়

তখন চায় কেবল শান্তি শান্তি প্রশান্তি ৮৭

দশম অধ্যায়

গীতার জন্ম হয় রণাঙ্গনে ৯৮

একাদশ অধ্যায়

অবতারে ঈশ্বর পেলে কি লাভ ঘুরে মরে ১০৭

দ্বাদশ অধ্যায়

'ভাগবতের পণ্ডিত' শ্রীম ১১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে কর্মে আঁট হয় ১২৫

চতুর্দশ অধ্যায়
দয়ায় বদ্ধ সেবায় মুক্ত ১৩৮
পঞ্চদশ অধ্যায়
ঐ ছিদ্রটি অবতার ১৪৯
ষোড়শ অধ্যায়
কাজে থাকবে দৃঢ়তা, শ্রদ্ধা ও শান্তি ১৬১
সপ্তদশ অধ্যায়
তাঁর জিনিস তাঁকে দেওয়ার নামই সন্ন্যাস ১৭১
অষ্টাদশ অধ্যায়
ধোঁয়া আকাশকে মলিন করতে পারে না ১৮০
ঊনবিংশ অধ্যায়
ঠাকুরের ভাব যে ধারণ করে সে ধন্য ১৯০
বিংশ অধ্যায়
ঠাকুরের লীলাস্থলী ভারতের জাতীয় মনুমেন্ট ১৯৭
একবিংশ অধ্যায়
আমড়া গাছে আম ফলাতে পারেন মা ২০৭
দ্বাবিংশ অধ্যায়
নববিধান ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব মিলন ২১৭
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
পূজারীর এককণা কৃপায় নরেন্দ্র জগজ্জয়ী ২২৮
চতুর্বিংশ অধ্যায়
গুরুদ্বারায় শ্রীম ২৪১
পঞ্চবিংশ অধ্যায়
গুরু নানক ও অর্জুনদেব ২৫১
ষড়বিংশ অধ্যায়
অন্তরের আবরণ ছিন্ন করতে পারে মানুষ ২৬৩
সপ্তবিংশ অধ্যায়
অবতার সূর্য, সাঙ্গোপাঙ্গ রশ্মি ২৭৪

* * *

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(অষ্টম ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

পঞ্চম সংস্করণ
কল্পতরু দিবস, ১৬ই পৌষ, ১৪১৬
(১লা জানুয়ারী, ২০১০)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬/৯২১৩১৩৪৪৮৭

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

❁ শ্রীম - দর্শন ❁

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(অষ্টম ভাগ)

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

শ্রীম - দর্শন ❀ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

৯

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দপ্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত

(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত

(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ

(১৬শ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)

(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial

(৫) A Short Life of Sri "M"

(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)

(৫) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
   579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
   Sri Ma Trust
   Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
   R-899, New Rajendra Nagar
   New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খন্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক